মনভাস

সুধীরচন্দ্র দাঁ

প্রাপ্তিস্থান
নিউ বানীশ্রী
৯/৪ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
বিজয়তোরণ প্রকাশনী
৬৩, রাসবিহারী ঘোষ রোড
বর্ধমান-৭১৩১০১

প্রচ্ছদ :
অশোক কুমার রায়
চালচিত্র
বর্ধমান

মুদ্রণে :
বিবেকানন্দ আর্ট প্রেস
৬৩, রাসবিহারী ঘোষ রোড
বর্ধমান।

প্রথম প্রকাশ :
দোলপূর্ণিমা ১৯৬৩

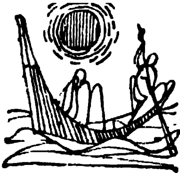
ঃ সূচীপত্র ঃ

উৎসর্গ

আমার মায়ের পুণ্য
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

গ্রন্থকার

বান



গাই থেকে দু আঁচলা জল নিয়ে মুখে চোখে দিল ভুবন। কালো চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে চিক চিকে ঘাম। পঞ্চাশ বছর আগের একটা দুর্দান্ত যৌবনকে যেন হাজার হাজার বিষাক্ত সরীসৃপ চামড়া কেটে এক দুঃসহ বেড়াজালের বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে।

কপাল থেকে খানিকটা ঘাম মুছে একবার আকাশের দিকে তাকালো ভুবন। তীরের ফলার মত আগুনের ঝলক এসে ওর চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিতে চাইল। বালির উপর ব'সে পড়তেই হু-হু করে কেঁদে ফেলল। আজ আষাঢ়ের শেষ। তবু একফোঁটা পানি নেই। হা-ভগমান্। ই মেঘ ছেড়্যা পানির দেব্তা কি পালাল? নইলে আজ ভরা দামোদরের এই চেহারা? চোখের আবছা জ্যোতিতে ভুবন সেই সেবারের ভরা দামোদরের কথা মনে করতেই বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

আষাঢ়ের এই বিচিত্র দামোদর। চতুর্দিকে উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি। কাশ, বেনা ও শর ঝোপের দাপট। সূর্যের রুদ্ররোষে আগুনের ফুলকি দিয়ে এক বিরাট অজগর যেন কোটি কোটি ক্ষুধার্ত্ত চাহনি আর বুবুক্ষার দীর্ঘশ্বাস ফেলে এতটুকু হ'য়ে গেছে। বর্ষার দুর্দান্ত দামোদর যেন কোন অভিশাপে নির্জীব ক্ষীণকায় হয়ে গেছে। ভোরের আগে দুফোটা শিশির পেয়ে তৃষ্ণার্ত্ত জিভটা চুক্চুক্ করে; আর দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে জিভের লালা পর্যন্ত শুকিয়ে গেলে এক বিরাট মুখব্যাদন করে একফোঁটা জলের জন্য গুমরে গুমরে কেঁদে মরে এই দামোদর।

ভুবন তা দেখতে পায়। দামোদরের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ। নদী যখন বর্ষার জল পেয়ে উন্মাদ হয়ে যায়, রাশিরাশি সাদা ফেনা নিয়ে

যখন সে সহস্র শতদল ফুটিয়ে সমারোহ তৈরী করে—ভুবন বলে, লদি ফুসেচে, চুপ কর সব। নদীর গর্ভে যখন সর্বনাশা ঘূর্নিতে বালি আর মাটি উগরে দেয় দামোদর—ভুবন বলে, লদির খিঁদে বাড়ছে, সাবধান। আবার নদী যখন দুর্দান্ত স্রোত বুকে নিয়ে উদ্দাম জলরাশির দাপটে ছুটে চলে—ভুবন বলে, লদির খিধে মিটে গেচে। এসব যেন ভুবন নিজের চোখে দেখতে পায়।

* * *

ভোস্ ক'রে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে একটা বাস এসে থামল ভুবনের সামনে।

—এ্যাই শালা, প্লেটটা সোজা ক'রে দে।

পা থেকে একটা আগুনের ঝলক পাক্ খেয়ে মাথায় উঠল ভুবনের। রাগে রি রি করতে লাগল।

—এ্যাই শালা। হুস নাই, না কি ?

কণ্ডাক্টার একটা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে উঠল।

ভুবন উঠল। প্লেটটা সোজা ক'রে দিল। ভোঁস ক'রে আর এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে বাসটা চলে গেল।

—শালা !

একটা রুদ্ধ আক্রোস ঘৃণা আর বিরক্তিতে ভুবনের ঠোঁটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল।

আষাঢ়ের দামোদরের বুকে বাস চলছে। ক্ষীণ জলধারার বুকে একটা কাঠের সেতু। আর বালির বুকচিরে ইস্পাতের কালো কালো ঝাঁঝরি প্লেট, তার ওপর দিয়ে দিবারাত্রি বাস, ট্যাক্সী, লরী ছুটে চলেছে। আর দুর্দান্ত দামোদরের সঙ্গে পাল্লা দিত যে ভুবন মাঝি, বুধন, হারু, জীবন, ফকির ও সুজন মাঝির দল, কালের কুটিল গতিতে তারা এখন কুলি। সারা বছর ধ'রে যে নদীতে তার পিতৃপুরুষ শক্ত হাতে লগি ঠেলেছে, হাল ধ'রেছে—আজ সেই নদীর বুকে তারা প্লেট সাজায়, বালি সরায়, জল দেয়। পুলের মিস্ত্রির হাতে কাজ যোগায়, খুঁটো পোঁতে, বাঁশ আনে। তারা এখন কুলি। তারা এখন নদীর

গর্ভে গর্ত খুঁড়ে গই তৈরী করে জল বের করে। আর দুর্দিনের অভিশাপ বুকে নিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদে এই ভুবন। যখন দুর্গাপুরে ব্যারেজ হ'ল জলের তোড় কমে গেল। তখন থেকেই তাদের হাত থেকে লগি খসে এল কোদাল, শাবল, কাঠারী। ভুবন রাজি হয়নি। হাওড়া থেকে একদল মিস্ত্রি এল। নদীর গর্ভে বড় শাল বল্লা গেড়ে নদির বুকে হ'ল পুল—কাঠের পুল। ভুবন অবাক। এই দামোদরকে কে বাঁধল? কোথায় আটকাল? সেই বিশ সালের ভরা দামোদর, সেই পঞ্চাশের ভরা দামোদর! তার তোড়ে এই পুল টিকবে? কিন্তু অবাক করে দিল ভুবনকে—সারা বছরই তো পুল রয়ে গেল। বর্ষার তোড়ে তো ধুয়ে মুছে গেল না!

ঠিকাদারবাবু একদিন এসেছিল। ছেঁচাবাঁশের ঘরের সামনে এসে ডাকাডাকি করেছিল :

—এ ভুবন, ভুবন—এই ভোবনা

বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মাথায় ঠিকাদারবাবু দাঁড়িয়ে। সুহাসি মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকে ভুবনকে ঠেলা দিল :

—ওঠ, ওঠ, ঠিকাদার বাবু ডাকচে।

লেপ মুড়ি দিয়ে ভুবন তখন বিছানায় কাঁদছে, শুয়ে শুয়ে চোখের জলে তেলচিটে বালিশটা ভিজে জবজবে। বলল :

—বল, শরীর খারাপ।

সন্ধ্যার আঁধার মেঘ-বৃষ্টির ঘেরাটোপে আচ্ছন্ন। পথ দেখা যায় না। ঠিকাদারবাবু চলে গিয়েছিল রাগে গজগজ করতে করতে।

—এতগুলো মিস্ত্রি এসেছে, তোরা যদি না যাস্, কোথায় লোক পাবো? সবাই গিয়েছিল। ভুবন কেবল যায়নি। ভুবন বলে :

—আমরা দামোদরের মাঝি? কুলিগিরি করবো না।

পরদিন ভুবন কুঁড়েয় বসে শুনছে : ঠক···ঠক · ঠক···আর প্রায় বিশজনের উল্লাস : হ্যাঁইও—মারি এক, হ্যাঁইও মারি দুই···আর ভুবনের বুকটায় কে যেন হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। একটা অস্ফুট যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠল ভুবন। সুহাসি সাত-তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল :—কি হ'ল?

ভুবন বুকটায় হাত দিয়ে রয়েছে। যন্ত্রণা হচ্ছে। সুহাসি হাত বুলোয়। শরকাঠি জ্বালিয়ে তেল গরম ক'রে এনে দেয়। মালিশ করে। সারা বিকেল পড়ে রইল ভুবন।

সন্ধ্যের পর গায়ে কাপড় দিয়ে বেরুল ভুবন। এল দামোদরের ধারে। আবছা আঁধারে দেখা যাচ্ছে, চকচকে জলের উপর কালো কালো খুঁটো পোঁতা। শর, বেনা, আর কাশ ঝোপের উপর এক ঝলক বাতাস এসে শিরশিরিয়ে দিল। যেন এক দুর্দান্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে রুদ্ধ আক্রোশে দামোদর খুঁসছে, কাঁদছে।

কখন আপন মনে ঘাটের কাছে চ'লে এসেছে। হ্যারিকেনের আলোটা তুলে ধরে ঘাটবাবু বলে, কে ভুবন? কই কাজে আসিস্‌নি? আজই মিস্ত্রিরা এল। হোই দেখ, কতগুলো খুঁটো পোঁতা হ'য়ে গেছে।

ভুবন একবার ঝাপসা চোখে চাইল। ঘাটবাবু বলে, কিরে তোর শরীর খারাপ নাকি?

—হ্যাঁ বাবু।

উত্তরটা দিয়েই আর দাঁড়ায়নি ভুবন। নেমে পড়ল নদীর গর্ভে। একটা নৌকো কাত হ'য়ে পড়ে রয়েছে। ধাক্কা লেগে হালটা ভেঙে গেছে। এক দিকটা ফুটো হ'য়ে হাঁ হ'য়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে নৌকোর গায়ে হাত বুলোতে লাগল ভুবন। লোহার জলুই দেওয়া সেলাই এক জায়গায় আলগা হ'য়ে গেছে। সেখানে হাত পড়তেই যেন চীৎকার ক'রে উঠল নৌকোটা। যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। একটা ভাষাহীন যন্ত্রণা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

টস টস ক'রে দু-ফোঁটা চোখের জল পড়ল ভুবনের। পড়ল নৌকোটার উপর। নীরব কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল ভুবন।

—আমি কি করবো? বল্‌। কি কাল এল, তোরাও মরে গেলি, আমরাও মরে গেছি। আমাদের দুর্দ্দশা বোঝ। এখন কুলির কাজ করতে হবে, নইলে খেতে পাবনি। বাপ ঠাকুর্দা তোদের নিয়েই জীবন কাটিয়েছে, আর আমরা?

হু-হু ক'রে কাঁদতে লাগল ভুবন। একটা ঝড়ো বাতাসে চারদিক

থেকে একরাশ বালি তীরবেগে ভুবনের পায়ে আছড়ে পড়ল। ভুবন বুঝতে পারছেঃ লদী তার পায়ে ধরছে। বলছে, আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। সেদিন সন্ধ্যেয় পীর পালামের কাছেই সে কাটিয়েছে। অনেক রাতে সুহাসির ডাকাডাকিতে উঠে বসেছে ভুবন।

—চলো, এখেনে পড়ে থেকে কি হবে? কাজে যদি না যাও, চলো, কাঠগোলার ঘাটে গিয়ে কাজ করবে। সেখেনে সারা বছর লৌকো চলে। সুহাসির যুক্তিতে মন মানে ভুবনের। হাত ধরে টেনে তোলে ভুবনকে।

* * *

পরদিন ভোরেই ভুবন আর সুহাসি কাঠগোলার ঘাটে গিয়ে উঠেছিল। সুহাসির বাবা ছিদেম, কাঠগোলার মাঝি সর্দার। এখানে নদী সদরঘাটের মত অত বীভৎস নয়, নয় ভয়ঙ্কর। এখানের দামোদর শান্তা ছিদেম ভুবনকে বলেঃ এখানেই লৌকো বা, কুলিগিরি কেন করবি? যেতে হবেক নাই সদরঘাটে। সুহাসি আশ্বস্ত হয়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভুবনের ছেলে পরাণ। এখানে দাদুর কাছেই থাকে। নৌকো বাওয়া শেখে। সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভুবন পরাণকে নিয়ে পড়ল। শক্ত হাতে, লগিটা ধরে বলেঃ দেখ এমনি ক'রে লগি ঠেলতে হয়। লদী যখন ফুসে ওঠে তখন এমনি ক'রে প্যাঁচ কষতে হয়। লদী যখন উগরে দেয় তখন এমনি করে মুখে লগি দিয়ে শালীকে বঁড়শি গাঁথা করতে হয়। লদী যখন ছুটতে থাকে, তখন এমনি করে বাইচ দিতে হয়……বুঝলি?

বারো বছরের ছেলে পরাণ ভুল করে। শক্ত হাতে প্যাঁচ কষতে পারে না। ভুবন রেগে যায়ঃ এক চড় কষায়—

—শালা, শালা এখানে মরা লদীতে থেকে মরে গেছিস? ভোমনা মাঝির ছেলে তুই? ক্ষ্যামতা নেই?

তারপর দম নিয়ে আবার বলেঃ কি কেরে শিখবি? শ্লার দামোদর কি আর ভরবে? তোদের দোষ কি?

সারাদিন টো টো করে উদভ্রান্তের মত ঘুরল ভুবন, আকণ্ঠ তাড়ি খেল। সন্ধ্যেয় ঘরে ফিরে দেখে ছিদাম শুয়ে পড়েছে। পরাণে একটা

লগির হুল তৈরী করছিল। হঠাৎ আলনা থেকে ছেঁড়া গামছাটা টেনে নিয়ে ভুবন বললে :

—সুহাসি, তুই কাল যাবি। আজ আমি চললুম।

—ওমা ! সে কি ? বাবা কি বলবে ?

—তুই যা হোক ব'লে বোঝাস। ই-শালার জায়গায় আমি থাকতে লারবো। শালার এক চিলতে লদী, যেন মরা হেলে সাপ।

সদরঘাটে ফিরে সারারাত দামোদরের ধারে হেঁটেছে ভুবন। পলেমপুরের এখানে ওখানে বসেছে, নদীর জলে মুখ ধুয়েছে, কপালে-চোখে জলের ঝাপটা মেরেছে। বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কত কি ভেবেছে।

তারায় ভরা আকাশ। হাজারটা জ্বলন্ত চোখ নিয়ে ওকে বিদ্রূপ করছে। ও উঠে প'ড়েছে। ভোর বেলায় কুড়েয় ফিরে ছেঁচা বাঁশের দরজা খুলে শুয়েছে। ঘুম ভেঙ্গেছে ঠিকাদার বাবুর ডাকে।

—ভোবনা, চ বাবু ডাকচে।

বাবু। ঘাটের মালিক। ভুবনকে বুঝতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করে ভুবনের ব্যথাটা বুঝতে।

— ভুবন।

—বাবু! জলভরা চোখে হাত জোড় করে দাঁড়ায়।

—তুই কুলির কাজ না করিস, না করবি। ঘাটে এসে বসে থাকবি। তা হলেই মাইনে পাবি।

—বাবু। এক অবরুদ্ধ বেদনা ঝর্ণা হয়ে বেরোবার পথ না পেয়ে মাথা কুটে মরে। ভুবন অস্ফুটে কি যেন বলতে চাইল। কি যেন বলতে পারল না। বাবু যেন তা বুঝে নিলে।

—হ্যাঁ, ঠিকাদারকে বলে দেব বুঝলি ?

সেই থেকে ভুবন ইচ্ছে হয়, কাজ করে, না হয়, না কাজ করে। অনেক ভেবেছে ভুবন, বাবুর আর দোষ কি ? বাবু আমাদের দেবতা, কখনো ঘাটে এসে বসে, জোয়ান ছেলেগুলোকে দেখে, উৎসাহে কাজ করে ওরা। ভুবন ভাবে, ভরা দামোদরের সঙ্গে ওরা কিন্তু লড়াই করতে ভুলে যাবে।

দামোদরের বুক চিরে বাস ছুটে চলেছে, লগি ঠেলার বদলে এরা

রাস্তায় বালির উপর জল ছিটোচ্ছে, প্লেটে বলি দিচ্ছে, প্লেট সোজা করছে। দুর্দ্দান্ত দামোদরের সাথে, এরা আর দাঁড়াতে ভুলে যাবে। কিন্তু ··হঠাৎ যদি দামোদর ফুসে ওঠে, তুফান ছোটে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা জ্বলন্ত চিন্তাস্রোত ভুবনকে যেন ফালাফালা ক'রে দিচ্ছে।

* * *

বাসটা চলে যাবার পর রাগে রি রি করতে লাগল ভুবন।

—দাঁড়া শালা। কোনদিন যদি এই নদী ফোঁসে তখন তো শালাদের দেখবো।

—ভুবন, ভুবন—এ্যাই ভোবনা—

ঠিকাদার বাবু ডাকছে। ই শালার কাজ করবেনা। ভুবন। গোঁ ধরেছে। কাজ ফেলে কাশ বনে গিয়ে ঢুকল। এখানে লুকোন তাড়ির ভাঁড় থেকে আকণ্ঠ তাড়ি খেল। আর বেহুস হয়ে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে রইল। আষাঢ় মাস। সন্ধ্যে থেকেই রিম ঝিম করে বৃষ্টি ঝরছে। অনেক রাত, ভুবনকে দেখতে না পেয়ে সব খোঁজাখুজি করছে, চারদিকে চীৎকার চেঁচামেচি।

—ভুবন, ভুবন ··ভু···ব···ন ··রে···ই···

বৃষ্টির জলে নেশা ছুটে গেছে ভুবনের, হুসও ফিরেছে। টলতে টলতে কাশবনের বাইরে এল, এল পীর পালামের থানে। সেখানে সুহাসি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার আঁচল ধরে টানে ভুবন।

—চ, ঘরে চ, আমি এয়েচি···

সুহাসি হু হু করে কাঁদে।

ভুবন জড়িয়ে ধরে সুহাসিকে।

—কি জানি, আমার কি যে হচ্ছে ·বুঝতে লারছি···

সুহাসির কাঁধে ভর দিয়ে ভুবন ঘরে ফেরে।

* *

কদিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। দামোদরের চর ডুবছে। কাশ, বেনা. শর আর হোগলার মাথায় জলের স্রোত চলছে। বনকলমীর ফুল কেবল জলের স্রোতে আত্মহারা হয়ে নাচছে। ওরা আনন্দে অট্টহাসি করছে। কাঠের পুলের উপরে ঢেউ। বাবুরা প্লেট তুলতে পারেনি, স্রোতের তোড়ে ভেসে গেছে। এদিকে পলেমপুরের চারদিকে নৌকো মেরামতির কাজ চলছে। ঠক্ ঠক্ ঠাকাঠক আওয়াজ, চেঁচামেচি, দৌড়াদৌড়ি, মিস্ত্রিদের মেজাজ। ঠিকাদারবাবু কদিন খোঁজ করেছে

ভুবনের। ভুবন কোথায়? মাঝিরা সব যেন তৈরী থাকে।

—এই ভোবনা লগি তৈরী ক'রে রাখ। পোল ভেসে যাবে জলের তোড়ে, কাল থেকেই লৌকো লাগবে।

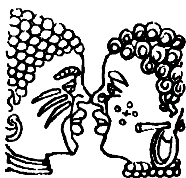
ভুবন কদিনই জ্বরে বে-হুঁস। শুধু জ্বরের ঘোরে কি যেন বলল একবার। কি যেন বলতে পারল না।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই ঝমঝমিয়ে আবার বৃষ্টি। সারা রাত,সারাদিন। দামোদর ফুলে উঠেছে, ফুঁসে উঠেছে। দীর্ঘদিনের ক্ষুধার্ত্ত অজগরটা ফুঁসে উঠেছে। কাশ, বেনা, শর, হোগলা, কন্টিকারী, সেঁকুল আর বনকলমী সব জলের তলায়। পোল ভেসে গেছে, কোন চিহ্ন নেই, শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা উদাত্ত কোলাহলে আনন্দে আটখানা।

গভীর রাত্রি। কে যেন ভুবনকে ডাকছে। ভুবন ··ভুবন··· ভুবন উঠে পড়ে। পাশে সুহাসি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বাইরে আসে ভুবন, তার যেন জ্বর ছেড়ে গেছে, গায়ে পঁচিশ বছরের শক্তি। এক ঝট্‌কায় ছেঁচা বাঁশের দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি সব জলে জলময়···। চারদিকে জল থৈ থৈ করছে। চীৎকার ক'রে উঠে ভুবন। নদীর দিকে ছুটে যায়। একটা লগি নিয়ে দোল খাওয়া একটা নৌকোয় উঠে পড়ে। হাঁকে ঃ লদী এ—য়ে- ছে, ঘরে কি কাল ঘুমে ধ'রেচে, এ··ই উঠে পড়···প···রা···ণে হোই··ছেঁচা বাঁশের দরজা খুলে সুহাসি অবাক। সে কেউটে সাপের গায়ে পা দিয়েছে। সারা শরীর তার হিম। দামোদরের উথাল পাথাল ঢেউ তার বুকে ঘা মারছে। মাতাল অজগরের সহস্র কোটি ফণার বিষাক্ত ফেনায় জড়িয়ে পড়েছে একটা শিকার। দূর থেকে আলো-আঁধারির মাঝে একটা কালো কীট যেন, তার উপর অস্পষ্ট সাদা বিন্দু। ঢেউ-এর আছাড়ে আছাড়ে সাদা বিন্দুটি দোল খাচ্ছে। ভেসে আসছে··

—এই, এই লদী এয়েচে · এই শালা লদী ফুঁসছে এই প্যাঁচে এ লদী জব্দ, এই উগ্‌রেছে এই বড়শির গাঁথ...। এই লদী খেতে চাইচে ...এই খিদে মিটিয়ে দিচ্চি এই বা··চ ·এ···ই···যে—

আষাঢ়ের বিচিত্র দামোদর শুধু উন্মাদের মত ঢেউ এর আছাড়ে আছাড়ে সাদা বিন্দুটিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।



জুয়া

শৈতানপুরের মেলায় আবার দেখা।

ফিতেটায় একটা চুমু দিয়ে নিলে সদরঙ্। লাল চোখে একবার কুত কুত করে তাকালো। আর মুহূর্তেই কেউটে সাপের মত ফণা তুলে ফিতেটা হিল্‌হিল্ ক'রে বিদ্যুতের মত কেঁপে গেল।

—সাবাস্ বেটা! সাবাস্—

এক মুখ খোঁচা খোঁচা কাঁটার মত গোঁফ আর বটের ঝুরির মত চুল-দাড়িতে বীভৎস সদরঙ্ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো।

—সাবাস বেটা! সাবাস;

পাশেই তালপাতার সেপাই এর মত আসগর লাফিয়ে উঠ্‌লো।

দুটো আঙ্গুল মুখে দিয়ে শব্দ করলো, কু··ঈ···ক কু···ঈ···ক। হিলহিলে ফিতেটা তত্‌ক্ষণে সদরঙের তেলচিটে হাতের তালুতে ভাঁজ হ'য়ে গেছে। যেন দুরন্ত অজগরের বাচ্চাটা সদরঙের জাদুদণ্ডে বশ মেনেছে। ফণা নামিয়ে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে গজরাচ্ছে। সদরঙ একবার ভীড়ের মাঝে চোখ বুলিয়ে নিলে।

—পাঁচ রূপেয়া ফেলবে, দশ রূপেয়া লেবে। দশ রূপেয়া ফেলবে তো বিশ রূপেয়া লেবে। ফকির রাজা হোবে—

কোমরের নীচে খাটো আধ ময়লা চোঙ্গা প্যান্ট পরা আসগর পাক দিয়ে নেচে উঠ্‌লো।

—রাজা ভি ফকির হোবে—

সদরঙ্ তালুতে একটু জল নিয়ে ফিতেটাকে একবার দলে নিল। যেন মন্ত্রপূত জল কেউটেটাকে নিজের খেয়াল খুশি মতো ছোবল মারতে নির্দেশ দিচ্ছে। চরকির মত চারিদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কপাল

থেকে ঝাঁকড়া চুলগুলো সরিয়ে দিলে সদরঙ্। মাটিতে কুণ্ডলী পাকানো নির্জীব সরীসৃপটা মুখ থুবড়ে পড়লো।

—এই যে বেটা।

সদরঙ্ ফিতের ওপর শেষ হাত বুলিয়ে নিলে: আঃ চুক্—চুক্—চুক্। হাতটা সরিয়ে নিয়ে কোলের দিকে টান দিয়েছে সদরঙ্। সেই মুহূর্তেই একটা ছুরির ফলা সাঁ ক'রে ফিতের মাঝে মাটি কামড়ে পড়লো। আর ভীড়ের মাঝে একজন চীৎকার ক'রে উঠ্লো: শওয়া রূপেয়া—

—কোন্ শালা?

সদরঙের কুতকুতে চোখ কপালে উঠ্লো ভাঁটার মত। কপালের কালো কালো ভাঁজগুলো কাঁপতে লাগলো। সামনে মূলোর মত হলদে দাঁতটা ক'য়েক ইঞ্চি বেরিয়ে এল।

—কোন্ শালা চাকু মারলি?

—আমি।

ভীড় ঠেলে একটা বাবরি চুল এগিয়ে এল। শীর্ণকায় হাড় বেরোনো একটা শয়তান যেন। গাল ও চোখ ভেতরে ঢুকে গিয়ে শয়তানের ছদ্মবেশ নিচ্ছে। ঢিলে পাজামাটায় গোটা পটি, তাও ছেঁড়া। পাঞ্জাবীটা পুরানো, আবার গিলে করা। দুহাতে ভীড় ঠেলে বাঁশের মত লম্বা লোকটা এগিয়ে এল। চোখে যেন ক্রূর হাসি উপচে পড়ছে।

—ছুরি মারলি কেনে রে?

সদরঙের বীভৎস দেহটা একবার কেঁপে উঠ্লো। ঝাঁটার মত গোঁফগুলো শক্ত ও খাড়া হ'য়ে উঠ্লো। প্রেতাত্মার মত আসগর কি যেন একটা অশ্রাব্য গাল দিল।

—বে শালা ছিনে জোঁক।

সদরঙ্ মুহূর্তে ছুরিটা তুলে ফেলতেই, লোকটা চাবুকের মত দেহটাকে বিদ্যুৎগতিতে বাঁকিয়ে সদরঙের হাতের মুঠিটা চেপে ধরলো,

—আবে শালা, দান ধ'রেচি, তুললে চলবে না চাঁদ।

লোকটার প্রচণ্ড ধাক্কায় ভারী দেহ নিয়ে সদরঙ্ একটু পিছনে ঢলে পড়লো। হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। লোকটা কিন্তু এক

হাত দিয়ে ফিতেটাকে চেপে ধ'রেছে। ফিতেটা যেন ভেতরে ভেতরে ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। লোকটা ঝাঁকড়া চুল নেড়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

—আ-বে শালা ফিঁতে ছাড়বি নি। চাকুর দাগটায় বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল পুঁতে বাবরি চুলো লোকটা প্রচণ্ড জোরে সদরঙের বুকে এক লাথি মারতেই সদরঙ্‌ একটা চীৎকার ক'রে উল্টে পড়লো। আর সেই ফাঁকে লোকটা অন্য হাতে ফিতেটার তু' মুখ ধরে টান দিতেই ফিঁতেটা তার বাঁ হাতে আটকে গেল। লোকটা এবার এক লাফে সদরঙের বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো,

—শ' রূপেয়া ফেল্ শালা।

আসগর এতক্ষণ থ' হয়েছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চাটাইয়ের নীচে টাকার থলিটা আঁকড়ে ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো : খুন, খুন··· পুলিশ···পুলিশ

চারদিকে জড়ো হওয়া লোক হাউ-চাউ ক'রে উঠ্‌লো। আরও ভীড় জমতে লাগলো। ওদিকে সদরঙ্‌ লোকটার তলপেটে এক লাথি মারতেই লোকটা তু'হাত দূরে ছিটকে পড়লো। চাকুটা সদরঙের হাতে লেগে হাতটা কেটে গেছে। তুজনের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে চাকুটা ছিটকে পড়েছিল। বাবরি চুলো লোকটা এবার চাকুটা হাতে পেয়েছে।

—শালা ; টাকা ফেল্, নইলে এইখেনেই তোর খেল্ খতম—

সদরঙ্‌ একটু সামলে নিয়ে হাঁকড়ে উঠ্‌লো, এই শালা আসগর ;

আসগর পিছন থেকে ফিতেটা দিয়ে লোকটার পায়ে সপাং ক'রে এক চাবুক কষাতেই লোকটা পড়ে গেল। কিন্তু আবার সে মরিয়া হ'য়ে সদরঙের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ছুরি হাতে।

সদরঙ্‌ ককিয়ে উঠ্‌লো : বু·· উ···ও···ও··· বু—উ···ও ও···

খুব ভীড় জমেছে। গোলমাল, চীৎকার, ছুটোছুটি, দাপাদাপি। মেলা ভেঙ্গে লোক জুটেছে। খুন খারাপির ভ'য়ে যে যার টাকার থলি আর মাল সামলাচ্ছে।

—থামো, থামো, আমার বাপিকে ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও···

দু'হাতে ভীড় ঠেলে কাঁদতে কাঁদতে একটা মেয়ে আসছে। সবাই পথ ছেড়ে দেয়।

— কেনে ; কি ক'রেছে আমার বাপি ?

ভীড় ঠেলে এল মেয়েটা। একেবারে সদরঙের মুখের কাছে। সদরঙ ততক্ষণে গোঙাচ্ছে। মুখের দু কষ বেয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। লোকটা বুকের উপর ব'সেছিল। মেয়েটা বিদ্যুতের মত ঘাড় ঘুরিয়ে বললে : তুই ? ফের এয়েচিস্ ? শয়তান, তোকে পুলিশে দোব। তুই আমার বাপিকে··· ?

ডুকরে কেঁদে উঠলো মেয়েটা। হাত দুটি নিয়ে মুখে চাপা দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। বেরো, দূর হ'য়ে যা, কেনে···কেনে আসিস ? এখেনে ·· ?

আস্তে আস্তে লোকটা উঠে দাঁড়াল। সদরঙের বুকের ওপর থেকে নেমে এল। চাকুটা মাটিতে ফেলে দিলে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

সদরঙ্ চোখ মেলে বিড়বিড় ক'রে ডাকলে,

— কাজরী।

—বাপি, কেনে তুমি ফের ঐ লোকটার সাথে—

—না। ও নিজেই এয়েচে। কাঠিব বদলে চাকু গেঁথেছিল।

সদরঙের মুখ থেকে গালের পাশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে এল। বোধ হয় একটা দাঁত নড়ে গেছে। গালের এক পাশ কেটে গেছে, সেখান থেকেও রক্ত ঝরছে।

সূর্য তখন মাথায়। গৈতানপুরের মেলায় এ ঘটনা নূতন নয়। অনেক খুন, খারাপি, আর অনেক মারপিটের একমাত্র সাক্ষী হচ্ছে ঐ বাবা পীর। তবে আজকের ঘটনার যেন কোথায় একটা যোগ আছে। যেন একটা ছেঁড়া, একটা টুকরো ঘটনা গৈতানপুরের মাঘী মেলার এই কড়া রোদে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। গা-গতরে আলসে ছাড়া শীতের এই চটক রোদে খুন হয়ে গেছে পর্যন্ত।

* * *

প্রথম দেখা হয়েছিল তালবনের মেলায়।

তখন সদরঙ্ জুয়ার আড্ডায় ফিতে ধরেনি। তালপাতার একটা

তেলচিটে ধরা ছোট্ট খুপরি, আর হাতের ছোট্ট হুক্কা। তেলের পোঁচ খেয়ে খেয়ে হাড়ের সাদা রঙে হলদে ছোপ ধরেছিল, সদরঙের দাঁতের মত। খুপরিটাও তেল খেয়ে খেয়ে তামাটে রঙের ছোঁয়া পেয়েছিল। সেবারেও মেলা মাৎ করে ফেলেছিল সদরঙ্। উঠতির আগের দিন রাত্রে হ্যাজাকের আলোয় সদরঙ্ যেন চোখে রঙীন ফানুস দেখে উল্লাসে নেচে উঠলো।

চাটাইয়ের নীচে জড়ো করা পয়সা আর নোটগুলোকে আঁচলা ভরে থলিতে ভরছিলো, আর বলছিলো,

—সব শালা লোপাট, সব শালা ফতুর…

পাশের বোতলটা থেকে ঢক ঢক করে দু টান টেনে নিয়ে সদরঙ্ যেন আরও চাঙ্গা হয়ে উঠলো। ভিতরের কলজেটা যেন আগুনের আঁচে লাফিয়ে উঠ্লো।

এক সময় এই লোকটা এসে হাজির। শীর্ণকায় লিকলিকে চেহারা, মাথায় বাবরি।—ওস্তাদ কী তল্পী তুলছো ?

—আ বে শালো, তল্পী পেতেই আছি। বলে সদরঙ্ বোতলটা মুখে পুরে গিলতে থাকলো। কেবল কণ্ঠনালীটা মুখের গ্রাস পেয়ে ফুলে ফুলে উঠলো, আর বিদ্যুতের বেগে নীচের দিকে নেমে চল্লো।

বাবরি চুলো লোকটা কিন্তু এক দৃষ্টিতে খুপরি আর হুক্কার দিকে চেয়ে ছিল। মাথার চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল,

—বাজি।

—কেতনা।

—পচ্চিশ রূপেয়া।

—হো…হো ক'রে হেসে উঠলো সদরঙ্। বাঁ হাত দিয়ে মুখটা পুঁছে নিলে। গোঁফ জোড়া ডান হাতে খাড়া ক'রে দিলে। খুপড়িতে হাড়ের ঘুঁটিটা ফেলে মুখ বন্ধ ক'রে জোড়ে নাড়তে লাগলো। সদরঙের হাসিতে ভারী দেহটা দুলে দুলে উঠছে—। বাঁ হাতে খুপরি, ডান হাতে খুপরির মুখ বন্ধ। ঘুঁটিটা ভিতরে খৈ ফোটার মত শব্দ ক'রে চলেছে। যেই উপুড় ক'রে ফেলতে যাবে, বাবরিচুলো লোকটা খপ করে সদরঙের ডান হাতটা ধ'রে ফেল্লো।

—চাঁদ, ভেতরে আঙ্গুল ঢোকাচ্ছো কেনে ?

সদরঙের হাতটা খুপরির মুখ থেকে জোর করে টেনে, কেবল তালুটা মুখের ঢাকনি করে দিয়ে বললে,

—এইসা মাফিক।

মদের ঝোঁকে ছিল সদরঙ্। একটু ঘাবড়ে গেল। রাত অনেক হয়েছে ভীড় নেই মেলায়। আকাশে মেঘ ছিলো, তাই শীতের জানানি নেই। একবার ঢোক গিলে, চোখ দুটো মুছে নিয়ে, খুপরিটা উপুড় করতেই,—ছক্কা।

সদরঙ্ গর্জন করে উঠলো—কি ?

—ছক্কা, ফেল্ পচ্চিশ রূপেয়া। বাক্য ব্যয় না করে ইশারা করে দিল আসগরকে। আসগর টাকা গুণে হাতে দিয়ে দিল লোকটার। সদরঙ্ উঠে পড়ছে দেখে লোকটা বললো,

—ফিন ধরবো !

সদরঙের একটু হুঁস হ'য়েছে। কুতকুতে চোখ নিয়ে হ্যাসাকের আলোয় লোকটাকে দেখে নিলে।

—কেতনা ?

—শ' রূপেয়া।

আবার ছক্কা পড়তেই সদরঙের মাথায় আগুন উঠে গেল সে তাড়াতাড়ি খুপরি আর ঘুঁটিটা থলিতে ভরে উঠে পড়লো।

—ও কি হ'লো ? আ-বে উঠছিস্ যে। তঙ্কা মেটা—

—ভর রাত, আর খেল হোবে নি।

—শালা জোচ্চোর,

ব'লে টুঁটি টিপে ধরেছিল সদরঙের। আসগর পিছন থেকে ঠ্যাং ধরে টেনে ফেলে দিয়েছিল, লোকটা উঠে আসগরকে ঘুঁষি মেরেছিল। ঘুঁষির পর ঘুঁষি। মারতে মারতে পাশের একটা ডোবায় ফেলেছিল। সদরঙ্ তখন টলছে। বেশি বাড়াবাড়ি না করে টাকার থলি আর তল্পীটা কাঁধে ক'রে চম্পট দিতে যাবে, দেখে, আসগর গোঙাচ্ছে। সদরঙের মেজাজ আর ঠিক থাকেনি। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

লোকটার উপর। কিন্তু হাড় জুলজুলে চেহারার লোকটার গায়ে কী ক্ষমতা! হাতে করে যেখানটা ধরে, মনে হয় যেন সাপের ছোবল পড়ছে। যন্ত্রণা করে, শিরা-উপশিরা দম বন্ধ হয়ে ফুলে উঠে। রক্ত কণিকা বা জীবকোষগুলো যেন দম আটকে মারা যেতে বসে।

—লোকটা এত শক্তি কোথা থেকে পেল?

জুয়ার আড্ডায় যে দু'চারজন ছিল, ভয়ে কেটে পড়েছিলো।

ভীড় কম হলেও চেঁচামেচি স্বরু হ'ল। খুন···খুন···পুলিশ··· পুলিশ—

এমন সময় কাজরী এসেছিল।

কুড়ি বাইশ বছরের কাজরী। তামাটে রঙের মুখটা হ্যাজাকের আলোয় চকচক ক'রে উঠলো। মাথায় এলোমেলো খোঁপা। একটা ছাপা সস্তা দামের শাড়ীতে গাছ কোমর করে বাঁধা। পড়ে থাকা থলি আর তল্পীটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে, মুহূর্ত্ত কয়েক বাদেই হাঁপাতে হাঁপাতে এস হাজির।

—বাপি!···বাপি!···

সদরঙ্ তখন পুকুরের ধারে পড়ে। নাক আর মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। লোকটা নেই।

একটু বাদেই জন দুই পুলিশ এল।

—কাঁহা গ্যয়া?

—মালুম নেই, সদরঙ্ বিড়্‌বিড়্ করে বললো।

আসগর উঠে বসেছে, সদরঙও

সেদিন রাতে সদরঙ্ ঘুমুতে পারে নি।

তালপাতার বেড়া, আর হোগলার ছাউনি দেওয়া ঘর। প্রত্যেক মেলাতে এই ঘর ঘুরে বেড়ায়। বাইরে একটা ঝাঁপ ফেলে শুয়ে থাকে আসগর! ভিতরে এক পাশে সদরঙ্, অন্য পাশে কাজরী।

সদরঙ্ একবার উঠে বসলো।

হোগলার ছাউনির ফাঁকে ফাঁকে ঝক্‌মকে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে। ছেঁচা বাঁশের দোরটা ঠেলে বেরিয়ে এল সদরঙ্। বাইরে বেশ

শীত। দূরে মেলা থেকে শব্দ আসছে। এখনো অনেকেই জেগে রয়েছে। মেলা সারা রাত চলে, তাই সারা রাত ধরে হৈ হুল্লোড়।

আকাশের দিকে তাকালো সদরঙ্। কাঁচের মত জ্বলজ্বলে আকাশ। এখানে ওখানে ছেঁড়া টুকরো মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। উত্তরদিকের উজ্জ্বল ধ্রুবতারাটা আরও রূপালী আভা পেয়েছে। একটুকরো কালো মেঘ এগিয়ে যাচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সদরঙ্। থলি থেকে খুপরি আর ঘুঁটিটা নিয়ে বাইরে এলো।

খুপরিতে ঘুঁটিটা ফেলে আনমনে নেড়ে মাটিতে ফেলতেই, ছক্কা পড়ল। সদরঙের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। হাত দুটো কাঁপতে লাগলো, চোখ দুটো জ্বলে স্থির হ'য়ে গেল।

বাঁ হাতে খুপরি আর ডানহাতের আঙ্গুল দিয়ে খুপরির মুখ চেপে শক্ত করে ধরলো সদরঙ্। বার কয়েক নেড়ে ফেলতেই, এক্কা, চৌকা, পঞ্জা…দাঁত কড়্মড়্ করে উঠলো। যেন বললে, ছক্কা নেহি…

অনেক রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল কাজরীর। বাইরে কি একটা পট পট ক'রে শব্দ হচ্ছে। বাপি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সকাল হ'তে এখনো দেরী আছে বোধ হয়।

মাঘের সুরু। সোঁ সোঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস তীরের মত বিঁধছে। ঘাঘরার উপর শাড়ীটা ভালো করে জড়িয়ে নিলে কাজরী। বাইরে আসগর ঝাঁপের আড়ালে জড়ো সড়ো হয়ে ঘুমুচ্ছে। চাঁদের অলোয় সারা মাঠ যেন চান করে উঠেছে। কাজরী দেখে, দূরে খেজুর গাছটার গোড়ায় ঝোপের আড়ালে কে যেন নড়ে উঠলো। কাজরী ডাকে,—কে?

কোন সাড়া নেই। এক পা এক পা করে কাজরী এগিয়ে গেল।

খেজুর গাছের গোড়ায় উঁচু আল। তার নীচেই ঝোপ। কাজরী আলে উঠতেই শক্ত চাবুকের মত একটা হাত ওর মুখ বন্ধ করে অন্য হাতে এক হ্যাঁচকা। কাজরী ঝোপের তলায় পড়ে গেল।

—চুপ। টুঁ করবিনি।

—কাজরী অবাক। সেই বাবরিচুলো লোকটা। হাতগুলো যেন কঞ্চি। কাজরীর দম বন্ধ হয়ে যাবে। ডান হাতের কব্জিতে ধরেছিল, শিরাগুলো ফুলে উঠেছে।

—উঃ ছাড়্ বলছি। কিছু করবোনি ছাড়্।

কাজরী ককিয়ে উঠলো। লোকটা কাজরীকে ছেড়ে দিলে। কাজরীর সারা দেহে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল। কাজরীর হাতটা কনকন করছে। সে সেই জায়গাটায় হাত বুলোচ্ছে; কিন্তু মনে হচ্ছে কাজরীর সমস্ত শিরা-উপশিরা, সমস্ত রক্তকণিকা, সমস্ত জীবকোষ, সমস্ত পেশী, সমস্ত দেহ যেন মাতালের মত উন্মত্ত হয়ে নাচছে। কিন্তু বাইরে কাজরী অবাক, কাজরী পাথর।

—কি নাম? ওস্তাদের লেড়কীর।

—কাজরী। তোর—

—বাবা।

—কি?

—কানে খাটো নাকি? 'বাবা', তার মানে ওস্তাদের 'বাবা', মানে তোদের জুয়োড়ীর 'ফাদার'। দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বললে। বলেই ফিক ফিক করে কালো দাঁত বার করে হাসতে লাগলো।

—কেনে? মনে লিচ্ছে নাই? 'ফাদার' নামটা মনে লিচ্ছে নাই? কাজরী কথা বলে নি। শুধু ছুটো চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

—নাম লিয়ে কি হোবে? নাম একটা ছিল্অ। তা উ শালার কে তরিবৎ করে বল্। তাই উ শালাকে বিদেয় দিইচি।

—আমার বাপিকে মেরেছিস কেনে?

—আরে বাহাস। তোর বাপি জুয়াচ্চুরি করলে যে! হুঁস্ করে দিস্। আমি এখেনেই আছি। ফের টুঁটি টিপে ধরবো। লোকটা আর কিছু বলে নি। চলে গিয়েছিল। এই গৈতানপুরেই কোথাও আছে। মেলায় এসেছে কাল।

সদরঙ্‌কে এ কথা বলতে পারেনি কাজরী। মেলার শেষ দিনে খুব ধুম। সবাই মাল কাবার করে দেবার তালে থাকে। তাই ছ' আনা

দশ আনায় কেনার লোভে যাত্রী আসে বহু। মেলার ভীড় দেখে জিনিসের দাম কোন কোন সময় বেড়েও যায়।

সারাটা সকাল ঝুম মেরে বসেছিল সদরঙ্। গা-গতরে বেশ ব্যথা। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাইরে আসগর চাটাইগুলো রোদে দিচ্ছে, শিশিরে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। কাজরী ইঁটের উপর কেট্‌লি-টায় জল ফুটুচ্ছে। দু মগ চা বাপিকে না খাওয়ালে চাঙ্গা হবেনি। উনোনের লালচে আঁচে কাজরীর তামাটে রঙটা আরও লাল দেখাচ্ছে। আড়চোখে বাপির দিকে চাইলো কাজরী।

— বাপি!

—উঁ।

—আজ আর আড্ডা বসিয়ে কাজ নেই। আমরা এখেন ছেড়ে চলে যাই চলো।

সদরঙ্ কোন সাড়া দিলে না। এক মগ চা খেয়ে শরীরটায় যেন একটু বল এলো। ডাকলে, আসগর।

- ওস্তাদ। বাইরে থেকে আসগর সাড়া দেয়। ছেঁচা বাঁশের দোরটা ঠেলে একটা উঁকি দেয়।

—আসর পাতবি চ।

—জী। আসগর একবার আড়চোখে কাজরীকে দেখে অদৃশ্য হল।

সদরঙ্ খুপরি আর ঘুঁটিটা নিয়ে মাথায় ঠেকালে। একটা জমাট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

মেলায় আজ প্রচুর লোক। এখনও আসছে—দূর দূরান্ত থেকে। হেঁটে দল দল আসছে, সারি বেঁধে। গোরুর গাড়ীতেও মাঠ ভেঙ্গে লোক জমছে।

সদরঙ্ও আসর জাঁকিয়েছে।

আসগরের কাছ থেকে গাঁজার কল্কেটা নিয়ে দুটো শক্ত টান দিলে। শরীরটা যেন তীরের ফলার মত সোজা ধারালো হ'য়ে উঠলো। থলি থেকে খুপরি আর হাড়ের ঘুঁটিটা বার করে হাঁক দিলে সদরঙ্—এই যে …এই যে…শকুনির হাড়, পিশাচের হাড়—কথা বলে, কাজ করে। মনে মনে যে চাইবে, তার গোলাম হবে।

খুপরিটায় একটা চুমু খেয়ে নাড়তে লাগলো। ঘুঁটিটা ভিতরে যেন মুক্তির লোভে মাথা খুঁড়ছে।

চোঙাপ্যান্ট আসগর মুখের দুপাশে দুটো আঙুল দিয়ে চীৎকার করে উঠলো, কু…ঈ…ক্, কু ঈ…ক্।

সদরঙ হাঁক দিলে—দশ রূপেয়া ফেলবে, বিশ রূপেয়া মিলবে; বিশ রূপেয়া ফেলবে তো পচ্চাশ রূপেয়া মিলবে। কথা বোলবে, হাড় কথা শুনবে।

ভীড় জমে গেল।

সেদিনের কথা মনে আছে সদরঙের। বেশ জুৎ করে চারে মাল এনেছিল। একজন পকেট থেকে দশ টাকা দিয়ে বউনি করেছিল। সেটা সদরঙ্ ছাড়েনি। কিন্তু পরের দানেই বিশ রূপেয়া পাইয়ে দিয়েছিল।

চার এমনি করেই ধরাতে হয়। সদরঙ্ তা জানে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তার থলিটা নোটে আর খুচরোতে ভর্তি হয়েছিল।

সূর্য তখন মাথায়। মেলা তখন আধ শেষ, সেই সময় গলদঘর্ম হয়ে সেই হাড় জুলজুলে বাবরিচুলো লোকটা আবার হাজির।

তাকে দেখেই কিন্তু সদরঙ্ চোখ কাপালে তুলে আসগরকে কি ইসারা করলে। আসগর চাটাই গুটোতে আরম্ভ করিল।

—কি হ'ল রে?

বাব্‌রি চুলো লোকটা কোমরে হাত দিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো।

—এখেনের খেল্ খতম হোল।

—মানে? খেলা হবেক নাই?

—না। তলপী উঠ্‌ছে।

আর থাকতে পারেনি বাব্‌রি চুলো লোকটা। এক লাফে সদরঙের টুঁটি টিপে ধরলো, শালা ··শালা··· খেলবিনি। তোর বাপ খেলবে ··

—না, আমার খুশি, আমার গরজ, তো শালার কি···

এক ঝটকায় লোকটাকে ঝেড়ে ফেলতে যায় সদরঙ্। কিন্তু যেন ছিনে জোঁক। তার কাঠির মত শক্ত হাতে যেন নাগপাশের বাঁধন। সদরঙের কলজেটা যেন ক্রমশঃ বসে যাচ্ছে। তলপেটে ছুটো লাথি মারলে সদরঙ্। কিন্তু লোকটা এক চুল নড়ে নি। সদরঙের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। দম বন্ধ হ'য়ে আসছে। চোখের সামনে মেলার হাজার হাজার লোক যেন চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো। পিশাচটা শুধু বিড়বিড় করে বললে, তো শালকে খতম ক'রে···

ঠিক সেই সময় কাজরী এসেছিল।

এসেই সদরঙের চটিটা নিয়ে লোকটার গালে মেরেছিল সজোরে। চীৎকার করেছিল, তোকে পুলিশে দেবো, তুই খুনে, তুই পিশাচ।

লোকটা সদরঙকে ছেড়ে দিয়েছিল। টুঁ শব্দ করেনি। কারো দিকে তাকায়নি। ঘাড় গুঁজে ভীড়ের মাঝে মিলিয়ে গিয়েছিল। ভীড় থেকে নানা ধ্বনি উঠেছিল।

—আ-বে শালা দেখলি? জুতোর ঘায়ে বাঘ একবারে পোষা মেনি।

—একটা টুঁ শব্দ করলো নি। বটে বাওয়া পীরিতির খেল ·

ডাক্তার ডাকতে হ'য়েছিল রাতে। কণ্ঠনালীটা ফুলে গেছে। সেঁক তাপ দিয়েছিল কাজরী। একটু বেশি মদ খেয়ে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে রইল সদরঙ্। কাজরী গায়ে হাত দিলে, মাথায় হাত বুলোলে। একটু জ্বরও এসেছে বোধ হয়।

বাপিকে শুইয়ে দিলে।

এখনো চাঁদ ওঠে নি। সামনের মানুষকে দেখা যায় না। এত ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আসগর গেছে মেলাতলায়। শেষ রাতে একটু হৈ-হুল্লা করবে। কাজরী আজ আর রাঁধবে না। বাপির জন্যই রাঁধতো।

বাইরে বেরিয়ে এল। উঃ কি অন্ধকার। আজ একটু শীত কম। শাড়ীটা জড়িয়ে নিল কাজরী। খেজুর গাছটার কাছে কে যেন র'য়েছে মনে হচ্ছে।

এক পা, এক পা ক'রে এগিয়ে গেল কাজরী। মাঠে অতটা অন্ধকার নেই। ঐ ত উঁচু আলটা, ঐ তো ঝোপ। বেশ দেখা যায়, না কেউ নেই।

উঁচু আলটায় দাঁড়ালো কাজরী।

আর মুহূর্ত্তে একটা কঞ্চির চাবুক যেন তাকে এক হেঁচকা দিল। কাজরী সামনের দিকে আলের কিনারা ভেঙ্গে একেবারে নীচে পড়ে গেল। শাড়ীটা একটা সেঁকুল কাঁটায় লেগে চর-চর ক'রে উঠলো।

—হিঃ হিঃ হিঃ, তোকে পুলিশে দোব, তুই খুনে, তুই পিশাচ!

—ভারী মজা লাগছিল, বুয়েছিস্ কি-না, তোর কোথা শুনে ভারি মজা মনে হচ্ছিল।

হেসে গড়িয়ে পড়ছে লোকটা। কিন্তু কাজরীর দেহে সেই শিহরণ, সেই যাদু। যেন অবশ, পাথর ক'রে দিলে।

—বুয়েচিস্ তোর জুতিটাও মন্দ লয়। বেশ আয়েশ হ'ল। দেশলাই জ্বেলে একটা বিড়ি ধরালো। সেই আলোয় কাজরী দেখলে, লোকটাকে। আরও ভালো ক'রে দেখতে ভালো লাগছে যেন। তার কালো দাঁত আর তোবড়ানো গালে পিশাচ ছাড়া আর কি ভাবতে পারে সে? লোকটা যতই কদাকার হোক্, কোথায় যেন একটা মাদকতা আছে, আকর্ষণ আছে। কিম্বা কোন মন্ত্র, কোন তুক! নইলে তার বাপিকে যে মারতে চায়, তার সঙ্গে……

ভাবতে পারে না কাজরী।

—আ গেল যা। বো—বা ব'নে গেলি নে কি?

বিড়িটায় একটা জোরে টান দিয়ে কাজরীর দিকে তাকায়।

—আমার বাপিকে মারিস্ কেনে। মারপিট কোন দায়ে করিস?

—একশোবার করবো। শালী জুয়া—চ্চোর…শালা ঠকিয়ে পৈসা লেয়। ছেড়ে দোব…?

—কি—সে জোচ্চর? আর তুই কি, তুই যে পিশাচ…

হো—হো ক'রে হেসে উঠলো লোকটা, বললে, হুঁস্ ক'রে দিস্ কিন্তুক। বলেই লোকটা যাবার জন্য পিছন ফিরলো। কাজরী অবাক।

বলে, তুই কোথাকে থাকিস ?

—কেনে যাবি না কি ? বলেই ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

—তুই জুয়োড়ীর চাল ধরিস ক্যামনে ?

চাল ধরতে পারি নি, কিন্তু জুয়োচুরি করলে ধরতে পারি। ব'লে দিস্, উ শালার সব্বনেশে খেলা যেন সোজাসুজি খেলে। নইলে আমি বাওয়া ছিনে জোঁক। কাজরী বাপিকে বলেছিল সেই রাতেই। জ্বরে বে-হুঁস হয়েই সদরঙ এটা বুঝেছিল, এ খেলা তাকে ছাড়তে হবে। সেই মেলাতেই ঘুঁটির খেলা শেষ ক'রে দিল সদরঙ। খুপরি আর ঘুঁটিটাকে কাঠকুটো দিয়ে পুড়িয়ে দিল। খুপরিটা ছিল তেল খাওয়া তালপাতার। সেটা ধু-ধু ক'রে জ্বলে গেল। কিন্তু হাড়ের ঘুঁটিটা জ্বলে নি। যাবার আগে এই কথাটা একবার বলে যেতে চেয়েছিল কাজরী। খেজুর গাছটার কাছে ঝোপে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু লোকটা আসে নি। কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি।

—কাজরী! কাজরী!

সদরঙ্ হাঁক্‌ছে। গোরুর গাড়ী ভাড়া ক'রেছে। মাল চাপানো হ'য়ে গেছে। হোগলার ছাউনী গোল ক'রে গুটানো। যেখানটায় তাদের কুঁড়ে ছিল কাজরী একবার সেখানটায় দাঁড়াল।

তার মনটা কেমন করছে, কেমন যেন আনমনা, উদাস!

* * *

ওরা যাযাবর। ওরা বেদুইন। ঘর নাই। যেখানে যায়, সেইটাই ঘর। তাই ওদের রক্তের মধ্যে কোন মায়া, কোন মমতা, কোন টান নেই। কিন্তু মেলার এই ছোট্ট কদিনের কুঁড়েটা কি তাদের যাযাবরী রক্তেও নূতন তরঙ্গ তুললো! তাই কাজরী এখনো উদাস হ'য়ে যায়। ছুটো চোখ যেন কাকে খোঁজে।

সদরঙ্ নূতন ওস্তাদ ধ'রে পশ্চিম থেকে ফিতের খেলা শিখে এল।

কেউটে সাপের মত হিল হিল ক'রে এগিয়ে যায় ফিতে। হাতে একটু করে তেল নিয়ে ফিতের গায়ে পোঁছ দিয়ে সদরঙ তাকে বশ মানিয়েছে। ফিতের ভাঁজে আটক দেবে বলে যেখানেই কাঠি পুঁতুক,

সদরঙের হাতের কৌশলে ঠিক কাঠি ফসকে ফিতে বেরিয়ে আসবে।

— ভারি জব্বর খেলা।

গৈতানপুরের মেলায় এই খেলা চালু করলো সে। কাজরীকে সঙ্গে করেই সদরঙ্ পশ্চিম গিয়েছিল। এবার সে একা শেখে নি। কাজরীকেও শিখিয়েছে। শিখিয়েছে, হাত সাফাই-এর কৌশল। কেমন ক'রে কাঠি ফস্‌কে ফিতে বেরিয়ে আসবে। শরীরের অবস্থার কথা বলা যায় না। সদরঙ্ দেহে আরও ভারী হয়েছে। চুল আর দাড়িতে বীভৎস। লাল কুঁত কুতে চোখ। মুখের দু পাশে সাদা গোঁফ। হলদে মূলোর মত দাঁত। আর কপাল ও গাল ভর্তি তেলেঙ্গা সাপের মত অসংখ্য ভাঁজ।

গৈতানপুরের মেলায় সদরঙ্ হিরো। প্রথম দিনেই বাজি মাৎ। নূতন খেলা দেখবার জন্য আর জুয়ার দান ধরার জন্য সে, কি ঠেলাঠেলি!

কাজরী বার কয়েক এসে দেখে গেছে।

শীতের বেলা বাড়লেও মনে হয় এখনও সকাল। কাজরী রান্না বান্না করে শুয়ে, বসে, পথপানে চেয়ে ক্লান্ত হল। সদরঙ্ আজ দারুণ আসর জমিয়েছে। নাওয়া খাওয়া ভুলে গেল নাকি? কাজরী দরজাটা আটকে দিয়ে আবার একবার মেলায় গেল।

বেশ ভীড়। পিছন থেকে কে যেন শাড়ীতে একটা টান দিলে। পিছন ফিরে তাকাতেই কাজরী অবাক।

— কি চিনতে পারছিস?

—হুঁ, কোথায় ছিলি এদ্দিন?

— তোরা কোথা ছিলি?

— পচ্চিম গেলাম। চ ভীড়ের বাইরে।

কাজরী আগে, ঝাঁকরা চুলো লোকটা পিছনে। যেন একেই খুঁজছিল কাজরী। কাজরী অনর্গল কথা বলছে। যেন বাঁধ ভাঙ্গা জল স্রোত সমস্ত কিছুকে প্লাবিত করে শোধ নিচ্ছে। পশ্চিমের কথা, তার বাপির কথা, নূতন খেলার কথা। ফিতে খেলার কথা—

ছেঁচা বাঁশের দরজাটা খুলে কাজরী বললো, আয়—

—না ওস্তাদ আসবে এখুনি।

কাজরী বলে, তোর বাসা কোথাকে,

—হুই যে ভাঙ্গা মন্দির, সাদা ফেরানি উড়ছে, উখানে। যাবি নাকি, খোঁজ লিচ্ছিস যে?

—আমার বাপি, সে সর্ব্বনেশে খুপরি আর ঘুঁটি পুড়িয়ে দিয়েছে। একটা বিড়ি ধরালো লোকটা। কিন্তু তোর বাপি যে আজ বহুৎ দান জিতেছে, জমিয়েছে। শালার কোন জোচ্চরি আছে কি না ধরতে পারি নি।

—তোকে বাপি চেনে নি?

—না, চিনতে লারছে, ভিড়ের মাঝে ছিলম যে?

তারপর এক সময় দূর থেকে সদরঙকে আসতে দেখে লোকটা কেটে পড়লো। কাজরী ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বল্লে? লোকটা চলে গেল। চোখ দুটো একবার জ্বলে, নিভে গেল।

সেদিন রাত্রে খুব আরাম করে, নিশ্চিন্ত বেহুঁস হয়ে ঘুমুলে সদরঙ্। একটু বেশি মদ টেনে কাজরীকে বললে, একেবারে সকালে তুলবি। আসগর সারারাত আজকাল মেলাতেই কাটায়।

অনেক রাতে একটা শব্দ শুনে উঠে পড়ল কাজরী। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে সেই লোকটা। কঞ্চির মত হাতটা দিয়ে কাজরীকে এক হ্যাঁচকায় মাঠে টেনে ফেললো। বললে, চ—

শীতের আকাশে সাদা লেপের তলায় অগুণতি নক্ষত্র। কি নিশ্চুপ, কি প্রশান্তি। সব চাইতে কাছের দুটি উজ্জ্বল তারা এক টুকরো মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। সমস্ত আকাশ স্বচ্ছ, বাতাস কুয়াসায় ভরা, সাদা ঘোমটা টেনেছে। আর সারা মাঠ হিমে নিঝুম হয়ে আছে।

চার দিনের মেলা। তার পরও দুটো দিন কেটেছে। সদরঙের কেটেছে জুয়ার আড্ডায় মাতাল হয়ে, আর কাজরীর কেটেছে ভর রাতে বাইরে বাইরে। কী শিহরণ! কী উত্তেজনা!! কী মাদকতা!!! এক রাতে বেহুঁস সদরঙ্ উঠে দেখেছে, কাজরী নাই। বিছানা খালি। কিন্তু জুয়ার নেশায় কিছুই মনে থাকে না। দিনের বেলায় সদরঙ্

জুয়াতে বসলে যেন অন্য মানুষ। দীর্ঘদিন বাদে গৈতানপুরের মেলায় সে রাজা।

কিন্তু এই দিনটা শেষ হলেই সে তল্পী গুটাতো। আর এখানেও সেই শয়তানটা! এখানেও ফিতের কারসাজী ধরে ফেললো! উঃ লোকটা কি জাদু জানে। সে সব কথা তার মনে পড়ে।

ফিতের কারসাজিও ধরে ফেলেছে! কে? কে সে?? কেমন করে???

আস্তে আস্তে উঠে কুঁড়েয় এলো সদরঙ্। আজকেও কাজরীর কথা শুনেই লোকটা ছুরিটা ফেলে ঘাড় গুঁজে চলে গেল। আসগর এখনো মেলা থেকে আসেনি। কাজরী বাপির গায়ের রক্তের দাগ মুছে দিচ্ছে। সদরঙ্ একবার কাজরীর দিকে তাকালো। চোখে মুখে কি যেন উত্তেজনা, কি যেন মাদকতা! সে ব্যথার, না বেদনার? না অন্য কিছু??

কাজরী একটি কথাও আর বলে নি।

সদরঙ্ আর সারাদিনের মধ্যে আড্ডায় যায়নি। আসগরই এখন যা পারছে করছে। সারা বিকেল শুয়ে থাকলো সদরঙ্। সন্ধ্যে-বেলায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুলে। বললে, আজ আর রাতে কিছু খাবো নি। আসগর এক বোতল এনেছিল। সেটা আকণ্ঠ গিললো সদরঙ্।

* * *

অনেক রাত। ঘুম থেকে উঠে সদরঙ্ বাইরে এল। মেলা থেকে তখনও হল্লার আওয়াজ আসছে। ওঃ শালা কি জাদু জানে! ছিনে জোঁকের মত, ফিতের খেলাও জানে। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আগুন বহে গেল সদরঙের। ঘরের কোণ থেকে চাকুটা নিলে। আড়চোখে চেয়ে দেখলে, হ্যাঁ, ঐ ত সাদা মত, কাজরী ঘুমুচ্ছে, না বাইরে গেছে? বুঝতে পারলো না। মরুক গে।

মাঠে নেমে পড়লো সদরঙ্; মাঠ পেরিয়ে ছুটো পোড়ো মন্দির। রাস্তা বেশ দেখা যাচ্ছে। একটা কুঁড়ের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো সদরঙ্। দরজাটা খোলা। ভেতরটা অন্ধকার। পা টিপে টিপে ঢুকে পড়লো

সদরঙ্। একবার স্থির হয়ে শুনলো। হ্যাঁ—ঐ ত সাদা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শয়তান্‌টা ঘুমুচ্ছে। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মারলো এক চাকু।

—আঃ—ক'রে একটা অতি পরিচিত মেয়েলি কণ্ঠের চীৎকারে সদরঙের বুকটা কাঁপিয়ে দিলে। চাকুটা তুলতেই ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত এসে সদরঙের মুখে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত যেন কাউকে খুঁজতে গিয়ে সদরঙের গলায় এসে পড়ে হিম হয়ে গেল। সদরঙ্ কি এই জুয়াতেও হেরে গেল?

সদরঙ্ মূক! সদরঙ্ পাথর !!



টান

এই যে বাবু, চা খেতে কিছু দিন।

খোঁচা খোঁচা এক মুখ দাড়ি। কালো তামাটে রঙের এবড়ো খেবড়ো মুখটা একেবারে ঝুঁকে এলো। তেলচিটে গামছা কোমরে বাঁধা হয়নি তখনো। লাল পলি মাটির জলে হাত থেকে বাহুমূল আর লোমশ বুকটা ভিজে জর্‌জর্‌ করছে।

—এই যে বাবু কিছু দিন।

ব্রজবাবু মানিব্যাগটা খুলে একটা দশ নয়া ফেলে দিলেন। সুজন তেলাটে গামছার অাঁচলায় লুফে নিয়ে হলদে দাঁত বের করলো।

—জয় বউনি।

ভয় কাতুরে বুলা আঁতকে উঠলো। লোকটার বিকট চেহারা আর ঐ বীভৎস মুখের চোরা হাসিতে।

—কি খোকাবাবু, লদীতে খুব ভয় লাগচে?

ততক্ষণে অন্যান্য মাঝিরা বাঁশের লগি দিয়ে নৌকোর গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। আস্তে আস্তে নৌকোটা পাড়ে এসে একটা ঠোক্কর খেল।

বুলা বাবার হাত ধরে উঠে পড়েছে। আশ্চর্য হয়ে এখনও ঐ দানবটাকে লক্ষ্য করছে।

—ঐ লোকটা কে বাপু?

—ও হচ্ছে ঐ মাঝিদের সর্দ্দার সুজন মাঝি। ভারী ক্ষ্যামতা, এই দামোদরের ভর তুফানে ওর জুড়ি নেই।

আঁচলের পয়সাগুলো কোঁচড়ে গুঁজে নিল সুজন। কাদা মাখা হাতের তালু দুটো তেলাটে গামছায় ঘষে খপ ক'রে শূন্যে দুহাতে বুলাকে তুলে ধরলো!

—উ—ও উ—ও...

অজানা আশঙ্কায় শিউরে অব্যক্ত গোঙানিতে গগিয়ে উঠলো বুলা।

—ভয় কি খোকাবাবু? আমি তোমাকে নৌকো থেকে নামিয়ে দিচ্ছি।

এ্যা · এ্যাই···। এবার···এবারআর কিসের ভয়? এ্যা ··খুব ভয় লাগছিলো নদীতে?

ব্রজবাবু মানিব্যাগটা আবার বের করতেই জল টল্‌টল্ চোখে জোড় হাত করলো সুজন।

—না বাবু, ছিঃ, এর জন্যে পয়সা লেবো?

—কেন সুজন। আমি তোকে বখশিস দিচ্ছি, তুই নিবি না·?

—কি যে বলেন বাবু।

চোখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে জলভরা মেঘটাকে ঢাকতে চেষ্টা করলো সুজন। ব্রজবাবু বুলার হাত ধরে ততক্ষণে যাত্রীর ভীড়ে একাকার হয়ে গেছে।

ছোট্ট ডিঙিটাকে এক খোঁচে পাড় ছাড়িয়ে তরতরিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চললো। সাদা কাশফুলের রাশিরাশি গুচ্ছোগুলো গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে। মাঝে মাঝে পলি মাখা জলের হলুদে ফেনায় কাশের দুধ বরণ ঝালরগুলো জমাট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বর্ষার শুরুতেই দামোদর বিচিত্র ও আশ্চর্য ভঙ্গীতে অপরূপা হয়ে উঠেছে।

লগিটা তুলে নৌকোয় আলগোছে আটকে রাখলো সুজন। হালের পাশে চোরা খুপরী থেকে ভাঁড়টা এনে মুখের উপর কাত ক'রে ধরলো। আর ঝাঁকানী খাওয়া তরল পদার্থটা রুদ্ধ আক্রোশে সুজনের দেহ মনে তীব্র শিহরণ এনে দিলো। বাঁ হাতে মুখটা মুছে নিয়ে শুধু ভাঁড়টা রাখলো সুজন। এক মিনিট দম বন্ধ ক'রে ঝিমিয়ে রইলো।

শুধু অনিশ্চিত মন্থর গতিতে কাশের বনে নৌকোটা ছুটে চললো পাক খাওয়া জল আর নৃত্যপরা ফেনপুঞ্জকে ফাল ফাল ক'রে।

সন্ধ্যার আগেই সুজন আজ ঘরে ফিরে এসে দেখে সুবাসি সাত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

—কি হ'ল।

—কি হ'লো?

—না। কিছু না। দেহটা ভালো নেই।

—ওমা কি হ'ল—। জ্বর নাকি?

সুজনের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে। আশ্বস্ত হয়। না, কিছু না। তবে?

—আচ্ছা সুবাসি, আমাদের সুধন আজ বেঁচে থাকলে কতো বড়ো হ'তো?

সুবাসি স্তব্ধ হয়ে যায়। মুখটা ঘুরিয়ে কোন জবাব না দিয়েই চলে যায়।

কেবল অন্ধকারের ছায়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজন। স্যাঁৎসেঁতে দাওয়ায় বসে নখের আঁচড়ে ভাগ্যের রেখাগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে শোধ নিতে চায় যেন।

* * *

দুর্দ্দান্ত যৌবনে সুজন আর সুবাসি।

আঁতকুলার সুজন, আর গৈতানপুরের সুবাসি।

মাতাল আর বন্য; উচ্ছল আর উন্মত্ত; উদ্দাম আর অফুরন্ত।

প্রথম দেখা নদীর চরের মেলায়।

—হাঁ করে দেখছিস কি? যদি আরো ভালো ক'রে দেখতে চাস তো হোই ··ওপারের ছাতিম ফুল নিয়ে আয়।

ছাপা শাড়ীর গরবিনী যৌবন কটাক্ষ করলো।

—আ—মর। হাঁ যে বোজে না। বলি কানে খাটো না কি?

রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছিল বিশ-বাইশ বছরের পাথরের মূর্তিটা আর প্রায় তখুনি একরাশ ছাতিম ফুল এনে মেলা আঁতি পাতি করলো কালো বার্ণিশের পোঁচ দেওয়া মূর্তিটা। বুকের ভিতর তখন কে হাতুড়ির ঘা মারছে। শিরায় শিরায় উত্তেজনা···রক্তের স্রোত তখন ফুলে ফেঁপে ওকে অস্থির করছে।

এমন সময় এক বাঁদর নাচের জটলায় এক উদ্দাম ভঙ্গীতে হেসে গড়িয়ে পড়া সেই ছাপা শাড়ীর গৌরব ওকে থমকে দাঁড় করালো।

শাড়ীর উড়ন্ত একটা খুঁট ধরে এক হ্যাঁচকায় টেনে বার করলো ভীড় থেকে। আর খপ ক'রে একটা হাত টেনে নিয়ে উড়ন্ত পাখীর মতো উড়িয়ে নিয়ে চললো ছাতিম ফুল ওয়ালা।

—এই...এই আ · মর...ছেড়ে দে ..লাগচে।

একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে হাত ছাড়লো কালো দৈত্যটা।

—হিঃ হিঃ হিঃ হু...হু

– হেসে গড়িয়ে পড়ছিস্ যে? ছাতিম ফুল আনতে বলে পালিয়ে গিয়েছিলি কেনে?

—ও তাই বুঝি।

—না তো কি? পরে নে ছাতিম ফুল...

- তারপর?

এদিকে পিছনে মেলা ভেঙ্গে লোক ছুটে আসছে।

এই দিকে গেছে...ঐ দিকে গেছে...ঐ কাশের বনে হোই দেখা যাচ্ছে।...ধর · ধর শালাকে।

—তারপর? তারপর এই ..

ব'লে ছাপা শাড়ীর অবরুদ্ধ কামনাকে টেনে নিয়ে কাশের বনে লুকিয়ে চ'লে এসেছিল তেলাটে দানবটা। তারপর যথারীতি ওদের সামাজিক নীতিতেই ওরা ঘর বেঁধেছিল। সেই তেলাটে কালো দৈত্যটা আজ মুষ্ড়ে পড়েছে। সুবাসির উদ্দামতা নিথর হ'য়ে গেছে।

পাঁচ বছরের সুধন যখন ছ' বছরে পা দিলো। মাঝির ছেলে সুজন আর মাঝির মেয়ে সুবাসি একদিন ওর হাতে খড়ি দিলো। ছোট্ট একটা পানসীতে ছোট্ট একটা লগি সুধনের হাতে লাগিয়ে দিয়ে।

আমার সাত পুরুষ লোক ঠেলেছে, আর আমার ছেলে লোক ঠেলবে না, তো কি কলম পিষ্বে?

বলে সুজন। আর হোঃ হোঃ ক'রে ছ' বছরের সুধনের থতমত ভঙ্গীতে লগি ধরে হাসে। সুবাসিও হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—ধন আমার, মাণিক আমার ভারী মাঝি হবে। যত লোক থ' হ'য়ে দেখবে। ব'লে খপ করে কোলে তুলে নেয়—আর লুফতে থাকে সুবাসি।

নৌকোটা স্রোতের মুখে প’ড়েছে। সুজন লগিটা ধ’রে তর্‌তর্ ক’রে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর উদ্দাত্ত কণ্ঠে সুজন গান ধরে।

ওরে মাঝি রে—

গহীন গাঙে শক্ত হাতে হাল ধ’রে

কে শক্ত হাতে রে—”

এক সময় নৌকোটা ঘূর্ণিতে পড়তেই পাক্ খাওয়া জলটা যেন খল্ খল্ ক’রে হেসে উঠলো। আর নৌকোটা চক্রাকারে বোঁ বোঁ ক’রে ঘুরতে লাগলো। অস্থির স্নায়ুতে সুজন চীৎকার ক’রে উঠলো, সুবাসি—

—কি কি অমন করছো কেনে ;—সুবাসি এগিয়ে এসে ধরে সুজনকে।

—আঃ ছিঃ ছিঃ এই সর্ব্বনাশী…রাক্কুসী আবার ফুলছে, কাঁপছে।

—কি হ’ল তুমি অমন কাঁপছ কেন…

লগিটা শক্ত হাতে গেঁথে রেখেছে সুজন। খল্ খল্ করা জলটা নদী গর্ভের লাল বালি আর কাদা উদ্গীরণ ক’রে তখনো ফুলে উঠছে। সুজন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁশটা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে শূন্যে লাফ দিয়ে উঠ্‌লো, আর অশ্রাব্য ভাষায় দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। নৌকাটা এবার স্থির হ’য়ে দাঁড়ালো। সুজন এবার নৌকাটা এগিয়ে নেবার জন্য পিছনে লগির খোঁচ লাগালো।

—ওঃ এই সর্ব্বনাশী আমার সর্ব্বনাশ ক’রেছে, এই সর্ব্বনাশী আমাকে কাঁদাবে। সুবাসি তুই একটু ধর লগিটা। আমি একটু বসি। মাথাটা ঝিম্…ঝিম্ করছে।

সুধনকে কোল থেকে নামিয়ে মাঝির মেয়ে সুবাসি লগি ঠেলে।

—কিন্তু তুমি অমন ক’রে উঠলে কেনে ?

—ওখানে বালি আর কাদা খুলে আস্‌ছে। সর্ব্বনাশীর খিদে কি মেটে ?

—যা খায় তাই উগরিয়ে দেয়। এই তো এ বেটির কাজ, এখানে ‥ ওখানে ওগড়াচ্ছে। আর এই হাঁয়ের মুখে আমার বাবা একদিন ঘুরপাক খেতে খেতে তলিয়ে গেল।

—উঃ কি সর্ব্বনাশ।

সুবাসি শিউরে উঠলো। না—চলো পালিয়ে চলো এ নদী থেকে; চাষ করবে, হাল ঠেলবে ··কিন্তু না...না···মাঝিগিরি করতে পাবেক নাই তুমি।

সুবাসি চীৎকার ক'রে উঠলো।—সুধনকে মাঝি হতে দেবক নেই। এ তুমি···। সুবাসি, আমি এই রাক্ষুসী বেটিকে দেখবো। ঐ ঘুরন্ত চাকীর পেটে কি আছে··তবে আমার নাম সুজন মাঝি···। আমার বাবার শোধ লোব।

সেদিন ঝিম্ · ঝিম্ ক'রে বর্ষণ সুরু হ'য়েছে।

বিচিত্র ও সর্বনাশা দামোদর খল্ খল্ ক'রে আরো ফুলে উঠলো, আর রুদ্ধ আক্রোসে ফেঁপে উঠলো। লাল আর হলদে ফেনাতে সমারোহ তুলে কাশের ঢেউ খেলানো সাদা শীষগুলোকে সোঁ সোঁ গোঙানিতে উন্মত্ত করে তুল্‌লো। আছাড় খাওয়া ঢেউগুলো মুহূর্ত্তে প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগলো আর ক্ষুধার্ত্ত দামোদর লাল আর হলদে পলির বালিতে উসর পূর্ণ ক'রে এখানে উন্মত্তের মত্তো মুখব্যাদন ক'রে তা উদ্গীরণ করতে লাগলো।

এইমাত্র যে খেয়াটা ছেড়ে গেছে সেটা এখন মাঝ দরিয়ায় স্রোতের টানে যুদ্ধ করছে। এক নৌকা যাত্রী কলের পুতুলের মত নির্বাক নিস্পন্দ! আর আট আটটা জোয়ান মাঝি চীৎকার ক'রে লগি নিয়ে এই দুর্দান্ত দৈত্যটার কবল থেকে এদের মুক্তি ছিনিয়ে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

পাড়ে সুজন ব'সে তামুক টানছিলো আর দেখছিল। সেই খেয়াটা সে নিজে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ও · কি? ঐ রাক্ষুসে আবার হাঁ ক'রেছে; ঐ নৌকোর কয়েক গজ দূরে। সুজন চীৎকার ক'রে উঠলো· ····।

– হো···হু...প·· রা···নে সামাল নে···হু·· ই সুধন হু···ই...সঙ্গে সঙ্গে হুঁকোটা ছুঁড়ে ফেলে একটা লম্বা লগি নিয়ে ছোট পানসীটায় লাফ দিলো সুজন। আর রাক্ষুসে দামোদরের বুকে দাঁত কড়মড় করতে করতে ফুলতে লাগলো সুজন।...শালার খিদে মিটিয়ে···দোব।···

—জয় বাবা পীর পালাম।

আটটা মাঝি চীৎকার ক'রে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে চরকীর মতো ঘুরতে লাগলো। যাত্রীরা এক সঙ্গে অজানা বিপদের ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো।

—এ...ই...পরাণে, লগি টিপে ধর...। বলতে বলতে ততক্ষণে প্রমত্ত দৈত্যের মতো হুঙ্কার দিয়ে সুজন ঐ নৌকাতে উঠে পড়ে লগিটা টিপে ধরলো।

— সুজন কা!

—সুজন জেঠা!!

—সুজনদা!

—বাবা!!

এক নৌকা প্যাসেঞ্জার আর আটটা জোয়ান মাঝি অবাক। চৌদ্দ বছরের সুধনও অবাক। বয়সের কোঠা যাকে অবসর নিতে বলেছে; যে তার নিজের ছেলেকে হাতে ধ'রে লগি ঠেলা শিখিয়ে সারা জীবনের ক্লান্তি নিয়ে দিন গুজরাণ করবে, সেই সুজন আজ দৈত্যের মতো রুখে দাঁড়িয়েছে। আর হা...হা...ক'রে হাস্‌ছে।

চৌদ্দ বছরের সুধন, তার পেশল আর নিটোল ইস্পাতের শরীর নিয়ে বাবার কাছে এল; হাত থেকে আস্তে আস্তে লগিটা তুলে নিয়ে বল্‌লো

—তুমি যাও বাবা, আমরা আছি।

—আছিস্ তো হঁ-এর মুখে ঘুরপাক খাচ্ছিলি কেনে? ক্ষ্যামতা নেই...শেখাইনি ভীরু কাপুরুষ সব। দামোদরের সঙ্গে এমনিতে পাল্লা দেওয়া?

ছোট্ট পানসী নিয়ে উত্তেজিত সুজন ফিরে এলো। তাড়ির হাঁড়ি শেষ ক'রে বর্ষার জলে ভেজা শরীরটাকে তাতিয়ে নিয়ে ছুটে চল্‌লো।

—হা হা। হা.. সুবাসি...সু.. বা.. সি...

—কি?—অত হাস্‌ছ কেনে? কি হ'ল...

—আজ জব্দ ক'রে দিয়েছি ঐ রাক্ষুসেকে। আজ শোধ তুলে

নিয়েছি। ব'লে অট্টহাসিতে ছেঁচা বেড়ার ঘর কাঁপিয়ে তুলে সুবাসিকে জড়িয়ে ধরলো।

—ছাড়ো। বুড়ো বয়সে ভীমরতি।

—আঃ কি মজা···কি মন খুলে আজ গান গাইতে মন যাচ্ছে।

কিন্তু ভাগ্যের রেখা হিজিবিজি। সেখানে কোন গান না, না কোন আনন্দ। হিসেবের চুলচেরা বিচার সেখানে মেলে না...তাই ভাগ্যের খেলায় হিসেবের হেরফের হয়, নিশ্চই · নইলে সুজনকে সেদিন মন খুলে গান করতে হয় নি।

যখন মাঝ রাতে সুধনকে চ্যাং দোলা ক'রে নিয়ে এল, আর সুবাসি, সুধন—মানিক আমার' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলো। তখন সুজন শুধু টস্···টস্ ক'রে জল ফেলেছিল। শুনেছিল, ফিরতি নৌকোতে ঠিক ঐ ঘূর্ণিতেই কেমন বীরের মতো সুধন লগি টিপে ঠিক বাপের মতোই হা···হা···ক'রে হেসে উঠেছিল। কিন্তু ঐ রাক্কুসে গহ্বরের টানে ছিট্‌কে পড়তে হয়েছিল ঘূর্ণির গহ্বরে। যখন ভেসে উঠলো. তখন সুধন আর এ জগতে নেই। তাকে মুচড়ে দুমড়ে নরম তলতলে কাদার মতো একটা ডেলা ক'রে আবার উগরে দিয়েছিল খানিকটা তফাতে। চোখের জল মুছে আবার নিজের হাতে সুজন লগি ধরলো।

ছেলেদের আর একা ছেড়ে দেয় না। সে নৌকোতে ব'সে উপদেশ দেয়, শেখায়·· হাল ধরে···হাল ঘোরাও। খোঁচ লাগাও···টিপে ধরো। এই গাঁথ, এই বাচ, এই প্যাঁচ···এই রাক্কুসীর খিধে মিটছে···এই···এই হ্যাঁ · হ্যাঁ এমনি ক'রে, সাবাস বেটা।

হায়রে...। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এখন সমস্ত জোয়ান ওর ছেলে।

* * *

এমনি এক বর্ষণমুখররাত্রে সুজন স্বপ্ন দেখছিলো, ডাকছিলো সুধন সুধন···।

পাশে সুবাসি। সন্তান হারিয়ে নির্বাক।

উঠে পড়লো সুজন। ঘাটে এলো, একটা পাল্কী নিয়ে কে হাঁকা-হাঁকি করছে।

—খুব অসুখ হাসপাতালে দিতে হবে। চলো ভাই যা নেবে তাই দোব...পাঁচ···দশ···কুড়ি···পঞ্চাশ।

অনেক রাত। চেনা যায় না কে? এগিয়ে এল সুজন, কে বসুজ বাবু··?

—এই···সুজন···ভাই। বুলার আজ অসুখ ক'দিন ধ'রে। ওপারে যেতে হবে ভাই।

—চলো বাবু। আমি যাচ্ছি।

—সুজন-কা। আমি যাচ্ছি।

—সুজন জেঠা! আমিও।

—না। পেছু ডেক না। আমি যাব তোদের কাউকে যেতে দোব না। তোরা পারবি না। অন্ধকারে নৌকোটা মিলিয়ে গেল নদীর বুকে; সুজনের হাত কাঁপছে, পা টলছে গায়ে বোধ হয় তার জ্বর। কিন্তু অন্ধকারে সে দৈত্যের মতো। কিন্তু এ···কি! কি !! আকাশ—নক্ষত্র—...জল সব একাকার হ'য়ে গেল কেন? তার একি হোল। বাবু···বাবু ব'লে চীৎকার ক'রে ঘুরে পড়ে গেল সুজন। আর নৌকোটা স্রোতের টানে ছুটে চললো পাক খেতে খেতে। পড়লো এক বিষাক্ত দুর্দান্ত ঘূর্ণিতে।

কেবল সকালের আবছা ভোরে পাগলিনীর মতো সুখাসি কেঁদে উঠলো।

একটা মৃত দানব এক হাতে ঘাটের বটগাছটার শিকড়টাকে শক্ত ক'রে ধ'রেছে, আর অন্য হাতটা উন্মত্ত স্রোতের টানে সর্পিল গতিতে এগিয়ে যেতে চাইছে যেন। দামোদরের বিচিত্র লীলা...তার বালুরাশির কণায় কণায় বিচিত্র ইঙ্গিত · কাশ-বেনা...আর শরবনের তীক্ষ্ণ পাতার শিরায় শিরায় দুর্দান্ত উন্মাদনা··· ঘূর্ণির পাক খাওয়া জলের উচ্ছ্বাসে উঁকি দেওয়া বীভৎস ক্ষুধা আজ একাকার হ'য়ে প্রচণ্ড স্রোত ব'য়ে চলেছে। তার টানে সুজনের দেহটা এখনো বিক্ষিপ্ত···এখনো বিধ্বস্ত হ'য়ে যায় নি কিন্তু।



গ্রাস

জল নেমেছে গো, হাতটা ধরবো নাকি দিদিমণি ?

—হিঃ হিঃ হিঃ, হাত ধরবি ? তোর যেমন এক কথা। তোর দাদাবাবু যে প'ড়ে রইল ··

—দাদাবাবু এক ছুটে এসে যাবে। তুই এই বেঞ্চেটায় ব'স। এই হালের খুঁটিটা ধ'রে।

—আমাকে নিয়েই বুঝি তোর বেশী ভাবনা ? হিঃ হিঃ হিঃ ··

—তুই ভারী হাসিস্ দিদিমণি।

—হিঃ হিঃ হিঃ। এই শোন্।

—কি ?

—কাছে আয়না মুখপোড়া, অত দূর থেকে কি শুন্‌তে পাবি।

—তোর যত সব খামখেয়ালী···

—এক কাজ করলে বেশ মজা হয়। লগিটা দিয়ে হু'খোঁচ ঠেলে দে না ··হিঃ হিঃ হিঃ।

কাঠগোলা ঘাট। তার ধস ছাড়া পাড় আর ক্ষয়ে যাওয়া বাঁশঝাড়ের গোড়া। কাশ, বেনা ও হোগলার ঝোপ জঙ্গলের মাঝে কণ্টেকারী, স্যাকুল আর ঝুপি বাবলার স্তূপ। তার ওধারে ঘাটের নিশান দিয়ে বুড়ো জামগাছটা আজ অথর্ব, তার শেকড়গুলো স্রোতের ঝাপটায় অসহায় হ'য়ে পলির গর্ভ থেকে খয়েরী রং নিয়ে বাইরে এসে হাঁপাচ্ছে। এইখানেই ঘাটের নৌকো বাঁধা থাকে। আর এইখানেই একটা চপল মেয়ের হাসি এখনো ঐ সনাতন, কেলো, গহর আর মাধো মাঝিরা শুন্‌তে পায়।

ওরা সব শুন্‌তে পায়। যখন তারাগুলো ডুব সাঁতার কেটে হঠাৎ একে একে এসে উঠ্‌তে থাকে, হোগলা-বেনা আর কাশগুলো যখন মৌজ

ক'রে গা দুলিয়ে শর্‌শর্‌ ক'রে গান ধরে, আর বুড়ো জামগাছটার কুণ্ডলী পাকানো কোটর থেকে যখন হাপর টানার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে,—তখন।

আঠারো বছরের পলা দৈত্যটার দিকে চেয়েছিলো। মাথায় একটা ফেরাণী বেঁধে মালকোঁচা পরা লোমশ পা আর বুক নিয়ে হালের পাশ থেকে লগিটা তুলতে গিয়ে মাথায় একটু ঠেকে গিয়েছিল পলার। পলা সেই যে চেয়েছিল দানবটার দিকে আর চোখ ফেরাতে পারে নি। কালো বার্নিশ করা রঙের উপর ঘাম তেলের পোঁচ দিয়ে যেন পেশী আর বুকের মাংসপিণ্ডগুলোকে জীবন্ত ক'রে তুলেছে।

তখনি বুধন বলেছিল,

—লাগলো নাকি দিদিমণি?

একটা মাঝির ছেলে কোন বুধন মাঝির কথাগুলো যেন মর্কটের মতো মনে হ'ল পলার। এই আঠারো বসন্তের পদ্ম-পরাগ দিয়ে যে যৌবনকে সে কোন প্রিয়-দয়িতের জন্য বরণডালার শোভা ক'রে রেখেছে, তাকে একটা মর্কট দাঁত বার করে কি বলছে? কিন্তু যাই হোক ছোঁড়াটার তারিফ না ক'রে পারে কই পলা? মাথায় ঝামরী চুলের পিছন দিকটা লাল সূতোলী দিয়ে বাঁধা। লগি ঠেলার সময় সে যেন অফুরন্ত যৌবনের শক্তি এনে ফেলছে। আশ্চর্য লাগে পলার। সেইদিন বিকেলের খেয়ায় আবার ফিরেছে পলা।

বাবার সঙ্গে বর্ধমানে কি যেন দরকারে গিয়ে আবার ফিরেছে আবার সেই বুধনের নৌকোতেই পা দিয়ে পলা অবাক চোখে তাকালো।

আবার লগি নিতে গিয়ে বুধনের চোখ পড়লো।

—দেখিস্‌, বাপু, আবার যেন মাথায় লাগে না।

—না গো না। একবার হয়েছে বলে কি? আবার।

বুধন মাঝি কাঠগোলার সনাতনের ছেলে। গোঁয়ার আর ডানপিটে ব'লে তার বাবার কাছে সে কতো মারই যে খেয়েছে, তার হিসেব কেতাব নেই, গায়ে দানবের শক্তি আছে ব'লে সে একাই দামোদরের বানে একশো। দু'হাতে লগিটা খোঁচ দিয়ে নৌকোটাকে দুলিয়ে দিলো বুধন।

—কেমন নৌকো চালাস তুই ? হুমড়ি খেয়ে পড়বো যে……

হো……হো ক'রে হেসে ওঠে বুধন। একটা আড় চোখে চোরা চাউনি দিয়ে লগিটা তুলে অন্য জায়গায় গাঁথলো বুধন। দু'হাতে জোরে ঠেলা দিয়ে সামনের দিকে ছল্……ছল্ করে তীর বেগে এগিয়ে নিয়ে চললো নৌকো।

আর কায়েতের মেয়ে অষ্টাদশী পলা দস্যুটার চাউনি আর লগি ঠেলার বহর দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে ঢোঁক গিললো। তার লোমশ বুকের দু'পাশে, হাতের ওপরে আর পিঠের দুদিকে ফোলা ফোলা মাংসপেশীগুলো বার্নিশ তেলের মেসেজ পেয়ে যেন নেচে উঠতে লাগল। এক সময় বুধন জিজ্ঞেস ক'রেছিলো :

—কি নাম গো দিদিমণি ?

আঠাশ কি তিরিশ বছরের বুধন। মাঝি মাল্লার কুলে যেন বেখাপ্পা। এ প্রশ্ন ? তাও আঠারো বছরের একটা পলা না চপলার সঙ্গে ?

—পলা।

—হিঃ হিঃ হিঃ। হেসে ফেলে বুধন। লগির গায়ের জল বুধনের হাতের চেটো দিয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে পড়ে, কনুই দিয়ে গড়িয়ে একেবারে বগলে, আর সেখান থেকে পাশে বসা পলার গায়ে। বুধন কখন বলে, ও……পলা না পলি……। পিছলে তুই গেলি।

খল্ খল্ ক'রে হেসে ফেলে পলা।

—ঠিক ধ'রেছিস্। পলিই ভালো নারে ?

—এই দেখ্না দিদিমণি, আমার লগিতে কেমন পলি লেগেছে।

—তবে তোর নাম ?

—আমার নাম বুধন।

—তবে তোর নাম থাক্ বুদ্ধু। আবার খিল্ খিল্ ক'রে হাসি পলার।

নৌকোয় কিন্তু আরো আরোহী ছিল। তারা কেউ কেউ বুধন মাঝির সঙ্গে একটা প্রগলভা মেয়ের এই নির্লজ্জ আলাপ পছন্দ করেনি।

ততক্ষণে বাবু ধাক্কা ব'লে বুধন লগিটা সামনের পলিতে গেঁথে

নৌকোটাকে আটকে দিয়েই পাড়ে নেমে পড়েছে।

তারপর বুধন না পলার বুদ্ধুর চোখ রইলো তার দিদিমণির দিকে, পলির দিকে। কখন আবার দামোদরের নৌকোতে তার পলিদিকে পাবে, তারই আশায় ব'সে থাকতো বুধন। আবার একদিন সত্যিই তার পলিদি এলো। সঙ্গে তার দাদা আর মা। বর্ধমানে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। ফিরবে শেষ বাসে।

—এই যে, দিদিমণি তোর জন্যে জায়গা রেখে দিয়েছি বস্। পলার মা অবাক। কাণ্ড দেখে পলাই বললো, আগেবারে এর নৌকোতেই গেছলাম। তাই আলাপ হ'য়ে গেছে। পলার মা বললা, ও মা! তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আর কি জোরে যে ও নৌকো চালাতে পারে দেখ না। হালের ঠিক পাশটাতে বসেছিলো পলা। পলাই জিজ্ঞেস করলো, কেমন ছিলিরে বুদ্ধু।

—ভালোই। এবার অনেক দিন বাদে যে।

—দৈনিকই তোর নৌকাতে চড়বার জন্যে আসবো?

—এলে তো কেমন নৌকোয় চাপতে পাবে।

—আ-হা। মরণ আমার। কথা শোন। আজ যাচ্ছি, সিনেমা দেখতে।

—কখন ফিরে আসবি?

আলাপ আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। বুধন পলাকে তুই বলে, পলা খুশীই হয়।

—রাতে ফিরবো। শেষ বাসে।

—ঠিক থাকবো কিন্তুক।

সেদিনের সন্ধ্যেয় আবার পলি তার নৌকোতেই চাপলো। সঙ্গে পলার মা আর দাদা। আকাশে সেদিন চাঁদ ছিলো না। তারাগুলো ফিনফুটে রয়েছে। বুড়ো জামগাছটার বুড়ো মড়মড়ে পাখাগুলো ঘর্ ঘর্ করে উঠলো, আর বেনা-কাশ হোগলার গোড়া দিয়ে তখন জল চলতে শুরু ক'রেছে। বর্ষাকাল। পলা হাঁকলো;

—বুধন……

—যাই দিদিমণি। পাঁজর বেরোনো শেকড়টার ওপর পলা বসলো। ওর মা আর দাদা পাশে দাঁড়িয়ে। পলার দাদাও একটা ডাক্‌লো, মাঝি…

—যাই বাবু।

বর্ষকাল ব'লে সবাই নৌকো ঘাটে লাগিয়ে চ'লে গেছে। কিন্তু বুধন থেকে গেছে। তার পলিদি ফিরবে। ঝিম্ ঝিম্…বৃষ্টিতে ভিজে তাড়ির ভাঁড় থেকে মাত্র এক চুমুক দিয়ে খেয়েছে বুধন। তাতেই গা-টা দিয়ে যেন আগুনের হলকা ব'য়ে যাচ্ছে। তারপর কখন বৃষ্টিটাও থেমেছে। বুধনের একটু ঢুল এসেছে, এমন সময় পলিদির ডাক।

—বুধন।

হ্যাঁ। ঐ তো বুধন আসছে। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। পলার দাদা একটু ঝেঁঝে উঠ্‌লো।

—শালাদের খেয়াল নেই! কখন থেকে যে ডাকাডাকি করছি।

—দাদাবাবু।

লগিটা মাটিতে গেড়ে থেমে গেল বুধন। অন্ধকারেও তার চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে।

—না—না রাগ করিস্‌নে আয়। ও আমার দাদা! কি বল্‌তে…

কিন্তু বুধনের মুখ দিয়ে আর কোন কথা সেদিন বেরুলো না। বলিষ্ঠ জোয়ান বুধন। যার শক্তি দামোদরের স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দেয়। সে সেদিন তার পলিদির একটা কথাও জবাব দিলো না—সাড়া দিল না। শুধু অস্বস্তি ভরা মন নিয়ে পলা কতকগুলো কথা বলে গেল।

—তুই কেবল আমাদের জন্যেই ছিলি বুধন?

—কিরে কথা বলিস্ না যে?

— তোর লগিতে কি আজ পলি লাগছে না?

এক সময় এধারে আতকুলার ঘাটে এসে নৌকো লাগে। এ ধারে বাঁশবনের গোড়ায় একেবারে মোহনপুর হানার কাছে এসে ঘা খেল নৌকোটা। বর্ষার শেষ খেয়ায় আজ লোক নেই। কে কোথায়

পালিয়েছে, আলো দেখাবার জন্যে ঘাটবাবুও নেই। থম্‌থমে মুখ নিয়ে বুধন নৌকোটার দড়িটা একটা খুঁটোয় বাঁধলো। পলা, তার দাদা আর মা নৌকো থেকে নেমে অন্ধকারে প্যাচপেচে কাদায় হোগলা আর বাঁশ বনের ভেতর ডুবে গেল।

ব'সে রইল বুধন। শোঁ শোঁ ক'রে একটা বাতাস বইছে। নদীর মাঝে ঘূর্ণির জল পিশাচের মতো বেপরোয়া হ'য়ে হেসে উঠ্‌ছে। আজ কিছুই ভালো লাগ্‌ছে না বুধনের। সে দড়িটা খুলে নৌকোতে চাপ্‌লো। লগিটা দিয়ে এক খোঁচে অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে দামোদরের জলকে হু-ফাল ক'রে নৌকা ছোটালো। মুখে শুধু অস্ফুটে একটা কথা বেরিয়ে এল :—পলিদি…

আর অন্ধকারের দামোদরে, তার তীর ভাঙ্গা ঘূর্ণি আর চর জাগা ক্ষীণ স্রোতের বিচিত্র পৈশাচিক কলহাসি। তার বুকে অন্ধকারের লোমশ দানব কোন এক বুধন মাঝি দু পাশের কাশ, হোগলা, বেনা আর শর বনের ভয়াবহ বিভীষিকাকে তুচ্ছ করে মাথার যন্ত্রণায় শুধু একটা কথা শোনে।

—তুই কেবল আমার জন্যেই ছিলি বুধন ?

—তোর লগিতে কি আজ পলি লাগছে না ?

পরদিন চোখ লাল ক'রে জ্বর গায়ে ভোরের সময় বুধন এসে নৌকো বেঁধে ছিল ঘাটে। বাবা সনাতন হাজারটা প্রশ্ন ক'রে একটাও জবাব পায়নি। জ্বর গায়ে বুধন সারা রাত জেগে কাটাতো। দিনের বেলায় বাঁশের ছেঁচা বেড়ার দাওয়ায় এসে কাঁথাটা গায়ে দিয়ে রাস্তার দিকে মুখ ক'রে বস্‌তো বুধন। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর। হ্যাঁ, এক বছরই তো হারিয়ে গেল বুদ্ধুর পলিদি। কোন এক দক্ষিণ দামোদরের গ্রামে যে বুদ্ধুর পলিদি থাকে, তা যদি জান্‌তো। কিন্তু…

আর ওদিকে হাস্‌নাবাঁধের কায়েতের মেয়ে পলা। সে কি কোনও এক অবসর সময়ে ভাব্‌তো দামোদরের দানব বুধন মাঝি পলিদি, পলিদি ক'রে অস্থির ?

একটা বছর ঘুরে আষাঢ় এলো। এবার দামোদরে আগে থেকেই

ঢল নেমেছে। দুপাশের উঁচু উঁচু চরগুলো ডুবে গেছে। দামোদরের তীর ছাপিয়ে জল কল কল ক'রে বাঁশ বনে ঢুকে পড়ছে। অবিশ্রাম দুদিনের বর্ষণের পর দামোদরের চেহারা হ'ল ভীষণ। হল্লা করতে করতে শুধু কাশ আর বেনা, বাবলা আর হোগলার মাথাগুলোকে বাঁচিয়ে জল ছুটে চললো ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেতে খেতে। বাঁশ বনের এক-গলা জল তীরের ছোট ছোট ঘেটু,কন্টিকারী,আকন্দ আর ঝুপি বাবলাকে চুবিয়ে রাখ্‌লো গায়ের জোরে। এই সময় দামোদরে খেয়া বন্ধ থাকে। যে খেয়া চলে, তাও বাবা পীর পালামের নাম্ নিয়ে অসংখ্য হরিধ্বনির মাঝে। তখন দামোদরের মাঝি মালাদের অবস্থা হয় অন্যরকম। তারা চোখ লাল ক'রে গায়ে অসীম শক্তি এনে, মুখে উত্তেজনার বুলি দিয়ে একগুণ চেহারাকে দশগুণ ক'রে স্রোতের বুকে পাল্লা দেয়।

বুধন মাঝির ছোট্ট পানসীতে এসে চাপলো একটি বর কনে। বুধন বাঁশ বনের ছায়ায় শুয়েছিল। এদিকে বিয়ের বাজনা শুনে উঠে বসলো। বরযাত্রী আর বাজনদারগুলো অন্য নৌকোয় চাপছে। আস্তে আস্তে সে একলাফে তার পানসীতে এসে অবাক। যে পলিদিকে আজ একবছর ধরে সে খুঁজে বেড়িয়েছে। এই রাস্তা আর ঐ ঘাট; নৌকো আর ফিরতি বাসের প্যাসেঞ্জারের মুখগুলোকে সে তন্ন তন্ন ক'রেছে। সেই পলিদি—আজ একেবারে বিয়ের কনে হ'য়ে দক্ষিণ দামোদর ছেড়ে চল্লো নাকি?

মাথার কাপড় সরিয়ে চেলী পরা একটা লাজুক উজ্জ্বল মুখ তাকালে বুধনের দিকে। পলার ট্রাঙ্কটাকে বাঁশগুলোর কাছে এনে গামছা দিয়ে মুছে বুধন বললো, ব'স্ দিদিমণি। ......

—কিরে কেমন আছিস বুদ্ধু?

পলা কথা কইলো ফিস্ ফিস্ করে। পলার স্বামী বিয়ের বর, ফুলের মালা গলায়, বেশ সুন্দর চেহারা।

সে ওদিকে তাকিয়েছিল। কথা শুনে বুধনকে বললো, কিরে তুই কি পলাকে চিন্‌তিস্ নাকি?

—হ্যাঁ গো দাদাবাবু। আমার পলিদি।

—পলি। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো নির্বাণ।

এবার পলি জবাব দিল। ... ..ও আমার বুদ্ধু তা জানো ?

—এসো দাদাবাবু, বসবে এসো। পলার পাশে নির্বাণ বসলো। আজ পলিদিকে সে পেয়েছে, কিন্তু বুধনের আনন্দ কই, উত্তেজনা কই ? অনেক দিনের খুঁজে-ফেরা-চোখ পলিদির পেছনে, ছোট ছোট চোখের কালো বল দুটোতে আজ দেবী হ'য়ে বেনারসী আর গয়না পরা, মাথায় মুকুট পরা ছবি ফুটে উঠেছে।

– কি সোন্দর দেখাচ্ছে তোকে, পলিদি।

—তাই নাকি বুদ্ধু। তাহলে তোর জামাইবাবু আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইবে না যে রে।

বুধনের লগি খোঁচ খেয়ে নৌকোটাকে ঠেলে দিল। নির্বাণ এবার একটু নির্জন পেয়ে পলার গায়ে একটা চিমটি কেটে কানের কাছে মুখ এনে বলে, নিশ্চই ছাড়বো না। এমন চাঁদমুখ পেলে কে আর ঐ আকাশের চাঁদের দিকে তাকাবে ?

—দাদাবাবু। আমার পলিদিকে নিয়ে চললে ?

—না রে ভাই। আবার সাতদিন বাদেই আমি তোর দিদিকে এখানে রেখে যাবো।

—তাই নাকি ? আনন্দে আর উত্তেজনায় অধীর হ'য়ে উঠলো বুধন। এবার তার পুরণো কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আমার বাঁশে যে পলি লেগে রইছে দাদাবাবু .....

—তাই নাকি ?

—হাঁ ! তাই পলিদিকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। পলিদি এই দামোদরের বুকেই থাকবে।

—বলিস্ কি বুদ্ধু ? তাহলে তোর দাদাবাবু যে–

—বিয়ে করলো, পলিদিকে. কাছে পাবেনা বল।

কথা কেড়ে নিয়ে বলে নির্বাণ। কাঠগোলার ঘাটে নেমে নির্বাণ একটা

টাকা দিল বুধনকে। বুধন সেটা পলাকে দিয়ে বলে, দিদি তোর ছেলে হলে, তার মামার মিষ্টি খেতে টাকা……

খল্ খল্ করে হেসে উঠলো পলা।

পলিদিরা চলে যেতে পানসীটা জাম গাছের শেকড়ে বেঁধে পেছু পেছু অনেকটা গিয়েছিল বুধন।

—যা বুদ্ধু, সাতদিন বাদে আবার তোর নৌকোয় চাপবো।

পলা আর নির্বাণ ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলো। নির্বাণ একান্তে কাছে পেয়ে পলাকে বাঁ হাত দিয়ে বুকের কাছে নিয়ে এল, মুখটা ডান হাতে তুলে ধরতেই দেখলো পলার চোখ টল্ টল্ করছে ···

—বুদ্ধু। দামোদরের মালাদের দৈত্যের মতো বুদ্ধু। ওর জন্যে কি কাঁদে? কিন্তু বুধন কেঁদেছে সারাদিন। সারারাত। কাঠগোলা ঘাটের ফিরতি প্যাসেঞ্জারদের না নিয়েই পাগলার মতো লগি ঠেলতে ঠেলতে তুফান ছোটা দামোদরের তীর ঘেঁষে কাশ বনের মাথার ওপর দিয়েই বুধন ছুটে চললো; সবাই হাঁকলো. এই……মাঝি……মাঝি। ওর বাবা ছইএর ঘরে ব'সে হুকো টানতে টানতে কোলাহল শুনে বেরিয়ে এল, বুধন ·· বুধো বুধো···হ ··ই···। লৌকো লিয়ে যাস···কোথা··· হো · ই · কিন্তু পলির বুদ্ধু তখন স্রোতের মুখে পানসী ভাসিয়ে ডাক ছাড়লো, : পলি ··পলি···পলি ··সন্ধ্যের সময় মাতাল হয়ে বুদ্ধু ফিরে এল। ছেঁচা বাঁশের কুঁড়েতে তার বাবার সাথে দেখা।

—সারাদিন ঘাটের লৌকো লিয়ে কোথায় ছিলি? সনাতন ওর চুলের মুঠিটা ধরেছে শক্ত হাতে।

—আমার পলিদি···পলিকে আনতে গেছলুম। বলেই টলে পড়লো। সনাতন তার মুখে একটা ঘুঁসি মেরে অশ্রাব্য ভাষায় একটা গাল দিলে। —শালা! জানিস্ সে ভদ্দর নোকের মেয়ে। প্যাচ পেচে কাদায় মুখ থুবড়ে পড়লো বুধন।

সাতদিন বাদে। পলা ঘাটের এক কোণে দৌড় আসছে। নির্বাণ তখন রিকসা থেকে নেমে তাকে পয়সা দিচ্ছে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামলো। দামোদরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আরো ভয়ঙ্কর হয়েছে।

হাঁপাচ্ছে পলি। হিঃ হিঃ ক'রে হেসে পানসীতে উঠ্‌লো। বুধন আনন্দে উত্তেজিত হ'য়ে পলির ডান হাতটা খপ্‌ ক'রে ধ'রেই এক হ্যাঁচকায় তুল্‌লো নৌকোয়।

খল্‌…খল্‌ হাসিতে পলি বল্‌লো, লগিটা দিয়ে দু খোঁচ ঠেলে দে না…

মাথাটা হঠাৎ ঘুরপাক খেয়ে গেল বুধনের। উনিশ বছরের পলা তার সামনে। মুখে খল্‌ খল্‌ হাসি, বুকে যৌবনের ডাক, গলায় নাকে চিবুকে কিসের যেন বিষাক্ত ছাপ; সিঁথিতে লাল সিঁদুরটা একটা বিষধর সাপ হ'য়ে উঠেছে। বুকের ব্লাউজের তলায় লাল গোলাপী পিণ্ড দুটোতেও যেন আঁচড়ের দাগ।

উন্মাদ হ'য়ে এক খোঁচে নৌকো একটা ঘূর্ণির মাঝে গিয়েই কাত হ'য়ে গেল। আর আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো, পলি…, বুধন…। সঙ্গে সঙ্গে কায়েতের মেয়ে উনিশ বছরের মালা এসে পড়লো একেবারে বুধনের বুকে। বুধন চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো: পলা…।

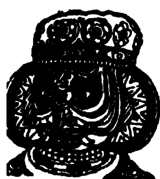
দু হাতে জড়িয়ে ধরলো লোমশ দানবটা।

আদিম পৃথিবী থেকে একটা পিশাচ ফেরারী হ'য়ে পালিয়ে এসেছিল এই পৃথিবীতে। তার লোভী বিবরটা মাংস পিণ্ডের লালসায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো সেই মুহূর্ত্তে; ছলনা আর শয়তানির নরম পলি নেমে গিয়ে বালিয়াড়ির চোরাবালি হাঁ-মুখো লেহন করতে চাইলো—।

জলের তলে আদিম পৃথিবীর রাত্রি। বুধন আর পলা। পলা নিঃসাড়। শুধু অক্টোপাশের একটা হাত একটা মাংসপিণ্ডকে মুঠো ক'রে ধরেছে, আর একটা হাত কেঁপে কেঁপে কিসের খোঁজে এখনো খামচিয়ে চ'লেছে।

নির্বাণ শুধু ঘাটে এসে, দেখে কাশের গুচ্ছ দামোদরের ঘূর্ণিতে চক্রাকারে মালার সমারোহ সৃষ্টি ক'রেছে।

আর সন্ধ্যার আকাশেই কালো মেঘটা রূপোলী চাঁদকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে।



রিপু

খুক, খুক, খুক—

খানিকটা হল্‌দে রংৎএর গয়ের তুলে থু ক'রে ফেলে দিলে জটাই-বাবা। পোড়া বিড়িটায় জোরে জোরে আরো দুটো টান দিয়ে পচ্‌ ক'রে থুতু কাট্‌লো। পাশের হোগলা আর কাশঝোপের মধ্যে তখন শোঁ শোঁ গোঙানি আরম্ভ হ'য়েছে। এক দৃষ্টে আঙার চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে উঠে পড়লো জটাইবাবা। মাকড়সা জালের মতো কাণা-শিকড়ের ঝাপি থেকে পাড়ে এসে উঠ্‌লো। দামোদরের পাড়ে।

—শালীর নিকুচি ক'রেছে।

একটা অশ্রাব্য গালি-গালাজ ক'রে নদীর ধারে, হোগ্‌লা আর কাশ-বেনার ভেতর ডুবে ডুবে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো জটাইবাবা। একেবারে দামোদরের ধারে, চর হোগলার কালো দহে।

আবছা সন্ধ্যের পর্দ্দার ভেতর দিয়ে চাপা জলের স্রোত দেখা যায় না। একটা সরু পায়ে চলা পথ কাশের বনকে চিরে দু'ফাঁক ক'রে—বন হোগলার জেলেপাড়ায় গিয়ে ঢুকেছে। পাঁশ রঙের কুৎকুতে চোখগুলো দিয়ে কালোদহের জলের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যায় জটাইবাবা। জ্বলন্ত বিড়িটায় ফস্‌ফস্‌ ক'রে দুটো সুখটান দিয়ে ছুঁড়ে দেয় কালোদহের জলে।

কাশ আর হোগ্‌লার হিল্‌ হিল্‌ শব্দের সঙ্গে জলটা একবার খল্‌ খল্‌ করে হেসে উঠলো। রূপোর পাতের মতো চক্‌চকে কালোদহে জলের কল্‌কলানী হাসি একেবারে যেন ঢেউ খেলতে খেলতে জটাইবাবার পায়ে এসে চুমু খায়।

আঙার চোখে জটাইবাবা ততক্ষণে সরু রাস্তা ধরে দহের ঘাটে পা ডুবিয়েছে।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তোমার লাজ সরম নেই। ফের এয়েছ এখানে?

—সোহাগী।

এক পা হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে ডান হাত দিয়ে মুহূর্তে সোহাগীর একটা হাত ধরে ফেলেছে জটাইবাবা। রূপোর পাতের মতো দহের জলে এক গলা ডুবে সোহাগী তখনো নিজের ইজ্জতটাকে ঢেকে রেখেছে। পাশে খালি কলসীটা উপুড় হ'য়ে ভাসছে।

—ছাড়ো, হাত ছাড়ো বলছি।

জটাইবাবার দেহের ভেতর তখন একটা দানব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে আরো একটু জলে দেহটাকে নামিয়ে দিলে। সোহাগীর গোঁয়ার হাতটাকে শক্ত করে পাক দিয়ে এক হ্যাঁচকা দিলে জটাইবাবা। জলটা আবার খল্ খল্ করে উঠ্লো।

সোহাগী এবার বে-আব্রু হ'য়ে জটাইবাবার পায়ের কাছে হাঁটু কি কি কোমর জলে এসে গেছে। তার ভিজে চুলের আলুথালু গোছা আর খসে যাওয়া কাপড়ের আঁচলা থেকে জল ঝড়ছে টস্‌টস্ করে। ডান হাতটা তখনো বেপরোয়াভাবে নড়াচড়া করছে ছাড়া পাবার জন্যে। বাঁ হাতে খুলে যাওয়া কাপড়ের খানিকটা বুকের ওপর দিয়ে কাঁধে ফেলতেই আদুল গা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো কল্ কল্ করে।

—সোহাগী।

উপোসী রিপু যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষিধে নিয়ে এসেছে।

— ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি। কেউ দেখে ফেললে…

—সোহাগী। ছাড়বো ক্যাম্‌নে। আর পারি না · উত্তেজনায় জটাইবাবা হাঁপাচ্ছে। হ্যাঁচকা খেয়ে সোহাগীর বুকটাও উঠ্ছে নামছে। আর চর হোগলার কালোদহের চারপাশে যত কাশ-বেনা আর হোগ্‌লা সব এক সঙ্গে আদিম রিপুর হ্যাঁচকা খেয়ে হিল্ হিল্ ক'রে নাচ্ছে। ভর সন্ধ্যে ব'লে দেখ্তে একটুও কষ্ট হয় না জটাইবাবার।

আরো একটু জোরে টান দিয়ে সোহাগীকে প্রায় গায়ের ওপর এনে ফেলেছে সে। কুৎকুতে চোখ দুটো আধ্ ইঞ্চি ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে। ঠোঁট দুটো বার কতক নড়ে উঠতেই জিভ্ বুলিয়ে নেয়—থুতু দিয়ে।

সোহাগীর হাতটা আর নড়ছে না। চুল, কাপড় আর গা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়া বন্ধ হ'য়েছে। জটাইবাবা কখন সুযোগ বুঝে সোহাগীর ভিজে কোমরটাকে দু'হাতে শক্ত ক'রে ধ'রেছে। ভিজে কাপড়ের জলে হাত দুটো আঠার মতো লেপ্টে গেছে।

জটাইবাবা দেখছে। মুখটাকে আরও নামিয়ে, চোখ দুটোকে আরও বের ক'রে এনে, কোমরটাকে আরও একটু আকর্ষণ ক'রে।

অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। কিন্তু ঐতো! ঐ তো মুখটা! ঐ নাকের নিঃশ্বাস এসে পড়ছে। তার গায়ে। ঐ গলা, ঐ চিবুক, ঐ ভিজে কাপড়ে লেপ্টানো দেহলতা! কাঁপছে! উত্তেজনায় আনন্দে বুকটা ওঠা নামা করছে। সব দেখা যাচ্ছে। সোহাগীর পঁচিশ কি তিরিশটি বসন্তের পাপড়ি মেলা যৌবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যেন শুঁকছে। ভিজে চুলের গন্ধ আর আদুল গায়ে এঁটে যাওয়া কাপড়ের সোঁদা ভিজে গন্ধ সে যেন গিলে যাচ্ছে।

সোহাগী আত্ম সমর্পণ করলেও, বিরক্তি প্রকাশ ক'রে। ব'লে,—

—ছিঃ, ছাড়ো, আমার যে একটা আট বছরের ছেলে আছে।

—তাছাড়া চর হোগলার তুমি যে চরবিবির জটাইবাবা।

চম্‌কে ওঠে জটাইবাবা।

অন্ধকারে একটা চাপা আক্রোশে ফুলে ওঠে সে। হাত দুটো কখন আলগা হ'য়ে যায় কোমরের জবজবে আঠা থেকে। ছাড়া পেয়ে সোহাগী দহের জলে সাঁতার কাটে।

কলসীটাকে বক্ বক্ ক'রে ভর্তি ক'রে কাঁকালে তোলে। ভিজে কাপড়ের একটা শপ্ শপ্ আওয়াজ কাশ-বেনার সরু সিঁথিতে মিলিয়ে যায়। পাশে দাঁড়িয়ে আণ্ডার চোখে জটাইবাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আর শুধু কালোদহে রূপোর পাত চিক-খাওয়া জল কাঁপে। দামোদরের কাশ, বেনা আর হোগলার সোঁ সোঁ গোঙানীর সঙ্গে উঁচু নীচু বালিয়াড়ির বালুকণাগুলোতে সর সর আওয়াজ অস্থিরভাবে ছটফট ক'রে।

* * *

লক্ষ্মীগঞ্জের মেলায় দেখা।

জুয়ার আড্ডায় একবারে শেষদিকে বসেছে জাফরুল আর ওস্তাদ। জাফরুল তখন ফিতেটায় হাতের মালাই থেকে জল নিয়ে ছিটোতে যাবে এমন সময় উবু হ'য়ে বসা ভিড়ের ফাঁক দিয়ে সোহাগীর কাঁচ-কাঁচ চোখ দুটোতে নিজের ছবি দেখ্‌লো।

জাফরুল ফিতেটা সতর্ক হ'য়ে গুটিয়ে এক হাতে ধ'রেছে, অন্য হাতে কাঠি নিয়ে হাঁক দিচ্ছে।

—লাখ টাকা রোজগার, লাখ টাকায় ফকির।

ওস্তাদ গাঁজায় দম দিয়ে জোলো চোখ নিয়ে হেঁকে ওঠে, বাজী ধরবে, টাকা পাবে ; ফিন ধরবে, ফিন পাবে—বাহবা...বাহবা খেল্।

জাফরুল সোহাগীর ওপর চোখ রেখে হেঁকে ওঠে,

—যে ধরবে চাল, সেই হবে লাল...লাগ্, লাগ্, বাজী লাগ্...

—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ ...

পাঁচ টাকায় বাজী ধ'রে একটা ষণ্ডা গোছের লোক ফিতে ধ'রেছে। ছোঁ মেরে জাফরুলের হাত থেকে কাঠিটা নিয়ে ফিতের ভাঁজে বসিয়েছে লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে জাফরুল ফিতের ডগ্‌টা ধ'রে ফর্ ফর্ ক'রে টানতে লাগলো। কাঠিটা মাটিতে গাঁথাই র'য়েছে, ফিতেটা তেলেঙ্গা সাপের মত খুলে ষণ্ডা লোকটার চোখের সামনে দুলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চোঁ চোঁ ক'রে আরও দুটো টান দিয়ে কলকেটায় ধূনী জ্বালিয়ে দিলো ওস্তাদ। ধোঁয়াটা গিলে মিনিট খানেক বুঁদ হ'য়ে থেকে হাউই-এর মত্নো ছেড়ে দিলে ওপর দিয়ে।

—ফেল্ বাছাধন পাঁচ রুপেয়া।

—শালা, জোচ্চোর।

ষণ্ডা লোকটা রুখে উঠেছে।

জাফরুল একটা হাত দিয়ে ষণ্ডা লোকটার ফতুয়াটা ধ'রেছে।

—উঠ্‌ছো কোথা মাণিক ? টাকা ফেলে যাবে।

জাফরুলের পঁচিশ বছরের পেশী বহুল যৌবন। আর কব্জির জোর দেখে ঘাবড়ে গেল লোকটা।

—পয়সা দোব ! শালা, জোচ্চোর।

—এ্যাইও…

জাফরুলের শক্ত কব্জি নেকড়ের থাবার মতো ফতুয়া সমেত লোমশ বুকটাকে কামড়ে ধ'রেছে।

—চাল মারবার জায়গা পাওনি? শালা! ফিঁতে ভাঁজে ভাঁজে উল্টে পাল্টে ভেঙ্গেছ! ফিঁতে গুটোবার নাম ক'রে চোখে ধুলো?

—ক্ষ্যামতা থাকে ধ'রে ফেল্ না। লেকিন পয়সা না ফেললে লাশ গাপ্ ক'রে দেবে…

জাফরুল এবার সত্যি সত্যিই ষণ্ডা লোকটার টুঁটি টিপে ধরলো।

—ছাড়্, ছেড়ে দে বল্‌ছি ‥

উঁকি দেওয়া সোহাগী এবার ভিড় ঠেলে একেবারে জাফরুলের নাকের ডগায় এসে হাজির। গাছ-কোমর বাঁধা আঁট-সাঁট গড়নে একটা ছাপা শাড়ী। দেহের ভাঁজে ভাঁজে লতিয়ে লতিয়ে উঠেছে। মাথার আলগা চুলগুলো হিল্ হিল্ ক'রে সাপের মতো দুল্‌ছে। নাকে একটা নাকছাবি। গায়েতে সস্তা দামের ছাপা ছিটের ব্লাউজ।

সোহাগী সোজা এসে জাফরুলের ফিতেটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিলে। ঘাড় হেঁট ক'রে নুয়ে জাফরুলের যে হাতটা লোমশ বুকটাকে কামড়ে ধ'রেছিলো, সে হাতটা সজোরে দুহাত ঝিনে দিতেই জোঁকের মত কামড় খাওয়া হাতটা খসে গেল।

ওস্তাদের নেশা এতক্ষণে চট্‌কে গেছে।

—এ্যাইও…টাকা ফেলে তবে যাবি…।

—দিচ্ছি টাকা। বাবা, তুমি ঘরে চলো।

যণ্ডা লোকটাকে সোহাগী দু হাত ধ'রে টেনে তুলতেই, একটা 'হুমকোশ' ছেড়ে ও উঠে পড়লো।

—সোহাগী, তুইও চলে আয়। এ জোচ্চোরের আড্ডায় থাকিস না।

তখনই জাফরুল নামটা জানতে পেরেছে।

সোহাগী…সোহাগী…সোহাগী…

জাফরুলের বুকের ধুকপুকুনিতে যেন সোহাগী নামের হাজার বেলুন নাচছে।

পাঁচ টাকার একটা নোট ব্লাউজের ভেতর থেকে বার ক'রে জাফরুলের মুখে ছুঁড়ে মারলো সোহাগী।

জাফরুল বোবা হ'য়ে গেছে। দেখ্ছে।

গেরো রঙের আঁট সাঁট গড়ন মেয়েটার। জাফরুলের হাত দুটো ধরতেই যেন পাষাণ হ'য়ে গেছে। হেঁট মুখে ফিতে সরাবার সময় তার একটা চুল ওর মুখে লেগে ওকে বোবা ক'রে দিয়েছে। যেন কালনাগিনীর দংশনে নীলবিষ মুহূর্তে ছড়িয়ে গেছে দেহের শিরায় উষ্ণ রক্ত স্রোতের জীবকোষে।

—ফিঁতে গুটোও, আমি বাজী ধরবো।

সোহাগী কোমরটা আরও একটু শক্ত ক'রে বেঁধে নেয়। মাথার দু পাশের চুলগুলোকে ডান হাতে সরিয়ে দিয়ে উবু হ'য়ে ব'সে কাঠিটা চাটাই থেকে উব্ড়ে নিল।

ওস্তাদ মৌজ ক'রে আবার কলকেটায় আগুন দেয়।

—কতকের বাজী।

—ঐ পাঁচ টাকারই।

—বহুত আচ্ছা, লাগ্…লাগ্…লাগ্…

ওস্তাদ নেশার ঝোঁকে কলকের আঙরাগুলোকে দপ্দপিয়ে টানতে লাগলো। আর পঁচিশ বছরের জাফরুল বিশ বছরের সোহাগীর কাছে বোবা হ'য়ে পাথর বনে গেল। কখন সে ফিঁতেয় জল খাইয়েছে, ফিঁতে চট্কে ভাঁজ ক'রেছে, চাটাইয়ে ফিঁতে বসিয়েছে—তাই জানে না। একবার সোহাগীর কাঁচ কালো চোখের তারায় নিজেকে উঁকি দিতে দেখেছিল। সোহাগী, উবু হ'য়ে বসা সোহাগী ; তার গলার নীচে বিন্দু বিন্দু ঘাম জম্ছে, ব্লাউজের ডোরাকাটা কালো ছাপগুলো দেহের ভাঁজে ভাঁজে যেন ঢল নামিয়েছে। বুকের দুপাশে দুই হাঁটুর চাপে শাড়ীটা ঘেমে আরও কালো হ'য়ে যাচ্ছে।

জাফরুলের মনের আয়নায় হাজার সোহাগী কথা কইছে তখন।

ঠিক জায়গায় কাঠি দিয়ে ফিঁতেটাকে গেঁথেছে সোহাগী। কলের পুতুলের মত জাফরুল কখন যে ফিঁতেটা টেনেছে তাও জান্তে পারে নি।

ফিতে টানতেই কাঠিতে আটকে গেল। তেলেঙ্গা সাপের মতো খুলে গেল না।

খপ্ করে টাকা পাঁচটা জাফরুলের আঁচল থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিলো সোহাগী।

—চললুম, শোধ বোধ।

এতক্ষণে খেয়াল হ'লো জাফরুলের। হঠাৎ সে খপ্ ক'রে সোহাগীর একটা হাত ধ'রে ফেললো। সোহাগী উঠ্তে যাবে, অবাক হ'য়ে বলে,—কি?

—কোথা যাও, ফিন্ ধরতে হবে।

জাফরুলের চোখের কোণে লুকোচুরির আকুলি বিকুলি। তার মুঠোর মধ্যে যেন সোহাগীর নরম হৃৎপিণ্ডটা ধিকিধিকি ক'রে নাচ্ছে। জাফরুল এই প্রথম বাজীতে হারলো।

ওস্তাদ চোখ কপালে তুলে সোহাগীর দিকে তাকাচ্ছে,

—পালালে চলবে না, ফিন্ ধরতে হবে। একবার জিতেছ, আবার···

—না আমার খুশি।

—এ্যাইও।

ওস্তাদ উঠে পড়েছে। সোহাগীও পিছু হটছে। সোহাগীকে ধরবার জন্য ওস্তাদ পা বাড়াতেই জাফরুল চেঁচিয়ে উঠ্লো,

—ওস্তাদ।

—কি?

—ও একবার জিতেছে, আর বাজী ধরবে না, ওর খুশি।

—ওঃ খুব যে।

ভ্রূকুটি করলো ওস্তাদ। কুলকাঠের আঙরার মত চোখ দুটো জ্বল্ছে।

হাতের মুঠো থেকে গ্রাস নিয়ে পালচ্ছে বিশ বছরের মাঝি মাল্লাদের মেয়ে সোহাগী।

—ও মাগী যে পালালো, ফাঁদে ফেলতে পারলিনে শালা!

ফাঁদে ফেলবে কাকে? জাফরুলই যে সোহাগীর মনের জালে আটকে গেছে। তার কাঁটাতারে জাফরুলের হৃদয়টা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। তবু জবাব দেয়,

—ওর খুশি, ও আর দান ধরবে না।

—শালা! বেইমান! এ্যাত্দিন তোকে এই শেখালাম? মনে মনে পীরিত? বেরো শালা…

জাফরুলের ঘাড় ধাক্কা দেয় ওস্তাদ। হুমড়ি খেয়ে টাল সামলাতে না পেয়ে দর্শকদের গায়ে ধাক্কা খায় জাফরুল।

বেশ ভিড় জমেছে। কেউ কেউ ব্যাপারটা বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে। মুচ্কি হাসছে, আর ফুট কাটছে।

জাফরুলের হাত থেকে ফিতেটা কেড়ে নেয় ওস্তাদ।

—দে শালা, ফিতে দে…। ফিতেটা নিয়ে পাকাতে পাকাতে বলে,

—এই লক্ষ্মীগঞ্জের মেলা বাবু, হরেক রকম খেলা। লাখ টাকা রোজগার বাবু… লাগ্… লাগ্…লাগ্…

ছাপ নাকী গেরো মেয়ে সোহাগী তখন মেলা ছেড়ে দক্ষিণদিকের বাবলা-শ্যাওড়া বনটার কাছে এসে পড়েছে। আর একটু পূবে গেলেই ছোট্ট শালি নদীটা পড়ে। দামোদরের বুক থেকে এটা বেরিয়ে এসেছে। তাই বালিয়াড়িও চোখে পড়ে এখানে ওখানে। সোহাগীর পিছু পিছু জাফরুলও চললো। তার চোখের মণি দুটো যে সোহাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ওকে ফিরিয়ে আনতে হবে, নইলে জাফরুল অন্ধ হয়ে যাবে।

—সোহাগী!

কাশফুলের গোছা নিয়ে বেণীর ডগে গুঁজেছিলো সোহাগী। পিছন ফিরে দেখে সেই ওস্তাদের সাকরেধ ছোকরাটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি? টাকাটা কাড়তে এয়েচ নাকি?

বালিয়াড়ির ওপর পা ছড়িয়ে ভালো ক'রে বসলো ছাপা শাড়ীর আবদ্ধ যৌবন।

—না, ও তো তুমি দান জিতেছ।

—তবে ? এখেনে আবার কি দরকার ?

- তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে ? কি দেখছ হাঁ ক'রে ?

—তোমাকে ? কে তুমি ?

—বাবরি মাঝির মেয়ে।

দামোদরের প্রবল বানের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বেঁচে আছে এই বাবরি মাঝিরা। এদের লগিই একমাত্র ভরসা। খরস্রোতো দামোদরের বুকে এরা এতটুকু ঘাবড়ায় না। 'জয় বাবা পীরপালাম' বা 'জয় মা চরবিবি' ব'লে আর্ত্তনাদ করতে করতে ওপার থেকে এপাড়ে নৌকো ভিড়োয়। সেই বাবরি মাঝির মেয়ে। অবাক চোখে জাফরুল তাকায়।

—তোমার কাছে হেরে গেলম ব'লে, ওস্তাদ তাড়িয়ে দিলে। আর ফিতে ধরবো না।

মাঝির মেয়ে সোহাগীও অবাক।

—ও মা, তবে পেট চলবে ক্যামনে ?

—সে দেখে লোব।

—কি ক'রে দেখবে, ক্যামনে দেখবে ?

—যে জিনিষ একবার হারে, ফিন জাফরুল আর সে জিনিষ ছোঁয় না।

—জাফরুল। মনে মনে যেন মুখস্থ ক'রে নিলে সোহাগী। ব'লে,

—যাবে আমাদের গঞ্জে ? খেয়াঘাটের লগি ঠেলবে ?

—যাবো। কিন্তুক তুমার বাবা ?

—সে ভার আমার।

—সোহাগী !

জাফরুল ঘন হ'য়ে বসলো। খপ্ ক'রে একটা হাত ধ'রে ফেললো সোহাগীর। সোহাগী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শালী নদীর বাঁকে শ্যাওড়া, সেঁকুল আর বাবলার বনে ডুবে যায়।

* * *

তারপর জাফরুলের নতুন জীবন। বাবরি মাঝি তাকে হাতে ধ'রে

লগি ঠেলা শিখিয়েছে। স্রোতের মুখে নৌকো সামলানো শিখিয়েছে। তিরিশ বছরের জাফরুল দুর্দান্ত যৌবনের বন্যায় ভেসে গিয়েছে। পেশী-বহুল দেহ নিয়ে একটা বীভৎস চেহারার মাঝি হ'য়ে গেছে।

জাফরুলের জন্য ছেঁচা বাঁশের একটা পরচালা নামিয়ে দিয়েছে। ছোট্ট কুঁড়েতে জাফরুল দামোদরের দিকে অবসর সময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দিন কাটায়। আর বাকী সময়টা তার চোখ দুটোকে ছেড়ে দিত সোহাগীর পিছনে পিছনে। প্রজাপতির মতো সোহাগী জাফরুলের চারদিকে ছুটে বেড়াতো, চরকির মতো জাফরুলও তাকে অনুসরণ করতো।

সোহাগী তাকে মন দিয়েছে কিনা জাফরুল আজও জানতে পারে নি। সে সোহাগীকে দুচোখ ভ'রে দেখতে পায়। কিন্তু কাছে পাবার ফুরসত কই? আদিম রিপুর বিবর থেকে নির্লজ্জ লালসা শুধু লিক্ লিক্ ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসতো ভর রাতে। সঙ্গে থাকে বাবরি মাঝি নিজে। রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে কুঁড়েতে লম্প জ্বেলে শুয়ে পড়ে। জল বা খাবার দেবার সময় শুধু সোহাগী একবার কাছে আসতো।

সে সময় জাফরুলের ভেতর একটা হাঙ্গর ফুঁসে উঠ্‌তো ফোঁস ক'রে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে যায়। গম্ভীগঞ্জের মেলাও ফিরে আসে। জাফরুল ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌লো, চল্, সোহাগী। মেলা দেখে আসি। বাবার কাছে কথাটা আর পাড়লো না সোহাগী। মেলার দিন জাফরুল বল্‌লে, আমায় একবার দেশে যেতে হবে সর্দার। বাড়ীর জন্যে মনটা আঁকু পাঁকু করছে। বাবরী মাঝি বললে, বেশ, দিন দুই থেকেই যেন চলে আসিস্।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

সঙ্গে গোটা কয়েক টাকা দিল বাবরি মাঝি।

দ্বারভাঙ্গায় জাফরুলের দেশ। সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে কিন্তু মেলায় এসে হাজির হ'লো জাফরুল। অনেক আলাপী লোকও এসেছে। তার পুরানো ওস্তাদ কই এবার আসে নি। সবাই তার চেহারা দেখে তারিফ ক'রেছে। বলেছে,

—আচ্ছা মন্দ হয়েছিস্ জাফরুল।

জাফরুল শুধু হাসে।

চান খাওয়ার বেলায় সূর্যি যখন মাথার ওপর সোহাগী তখন মেলায় এলো।

এক বছর বাদে জাফরুল আবার তাকে নতুন ক'রে দেখলো। এক বছরের বাড়তি যৌবনে তার গেরো রঙ একটু লালচে হ'য়েছে, গালে চিবুকে একটু রক্তের ছাপ উঁকি মারছে। দেহের আঁট-সাঁট বাঁধনের বাড়তি যৌবন আর তার দেহলতায় পেঁচিয়ে যাওয়া ভাঁজে ভাঁজে যেন একটু লজ্জার ঢল নেমেছে।

এক রাজ্যের লোকের সামনে মেলাতেই বোকার মতো খপ্ ক'রে সোহাগীর হাত ধ'রে ফেল্‌লো জাফরুল। কেউ হাসছে, কেউ চোখ টিপ্‌ছে, আবার কেউ রকম সকম দেখে শিস্ কাট্‌ছে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যেতে চাইলো সোহাগী। জাফরুলও পিছু পিছু ছুটলো। নামকে ওয়াস্তে টুকিটাকি কয়েকটা জিনিষ কিনে সোহাগীকে দিলো জাফরুল। তারপর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে চল্‌লো শালী নদীর বালিয়াড়িতে।

কিন্তু সোহাগী অদ্ভুত।

একটা হাত ধ'রে যখনই জাফরুল টান দেয় তখনই খিল্ খিল্ ক'রে একতাল কাদার মতো লদলদে হ'য়ে পিছনে ছিট্‌কে পড়ে সোহাগী।

···সোহাগী ··সোহাগী,

—হিঃ হিঃ হিঃ! কই ধর্‌না, ক্ষ্যামতা থাকে ধর্।

সোহাগী এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে।

আশ্চর্য। লগি ঠেলে ছোটা ভুলে গেল নাকি জাফরুল? দ্বারভাঙ্গার পশ্চিমী মুসলমান কি তিরিশ বছরেই অথর্ব হ'য়ে গেল? কিছুতেই সে সোহাগীকে ধরতে পারে না। বাবরি মাঝির মেয়ে সোহাগী এখন জাফরুলের কাছে উড়ন্ত প্রজাপতি। ধরবো ধরবো ক'রেও ধরতে পারে না।

—সোহাগী! সোহাগী!

—ছুটে ধরবার মুরোদ নেই ; সোহাগী, সোহাগী…

জাফরুল হাঁপাচ্ছে ! আর ছুটতে পারে না। প্যাকাল মাছের মতো এঁকে বেঁকে ছুটতে পারে মেয়েটা। জাফরুলের পা গুলো যেন ভারী লোহার মতো।

আক্রোশে ফুল্‌তে থাকে। কাছে পেয়েও পাচ্ছে না। সারা বছর সে এই দিনটির জন্যই যে বসেছিলো। একবার হাতের মুঠোয় পেলে দুহাতে…ডলে…পিষে…। মাথায় রক্ত উঠে যায় জাফরুলের। উত্তেজনায় শুধু স্নায়ুগুলো কাঁপতে থাকে।

—শালি ! একটা অশ্রাব্য কথা বেরিয়ে পড়ে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় ফিরেছিলো জাফরুল।

সোহাগী তার আগেই এসেছিল। বাবরি মাঝি জাফরুলকে দেখে অবাক !

—কি হ'ল ? গেলি না ?

—পকেট মেরেছে কোন্ শালা। রেলে যাবো ক্যামনে।

ওজর দিয়ে রাগে ভিতরে ভিতরে ফুল্‌তে থাকে জাফরুল। মনে মনে বলে,—শালা শয়তান ! একটা ধিঙ্গি মেয়ে পুযে রেখেছে আমায় ফঁদে ফেলবার জন্যে।

সেদিন থেকে জাফরুল অন্য মানুষ হ'য়ে যায়। কথা বলে কম।

অল্পেই চটে যায়। সোহাগীকে সহ্য করতে পারে না। ঝগড়া হয়, বচসা হয়—সোহাগীর সঙ্গে কথা কাটাকাটিও চ'লে। সোহাগী বলে, কি হ'লো তোর ? ভীমরতি ধ'রেছে নে কি ?

জাফরুল মুখ চোখ লাল ক'রে শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানে সোহাগীর দিকে, তারপর বেরিয়ে যায়।

বাবরি মাঝির সঙ্গেও ঝগড়া করে, কারণে অকারণে। খুশি হয় কাজ ভাল ক'রে করে, নইলে বেগার শোধা। বাবরিও ধমক দেয়,

—জাফরুল, কি হইচে তোর ? মস্করার জায়গা লয় এটা। নৌকোর লগি রেখে সোজা চলে আসে কুঁড়েতে। বাবরি হাঁকড়ে ওঠে,

—যেছিস্ কোত্থেকে ?

—দেহ খারাপ, কুঁড়েতে চল্‌ছি।

কুঁড়েয় এসে চোখ বুজে পড়ে থাকে। সোহাগী দেখতে পায়। ছেঁচা বাঁশের দরজাটা ফাঁক ক'রে ঘরের ভিতর উঁকি দেয়।

—কি হ'লো? চলে এলি যে?

জাফরুল জবাব দেয় না। শুধু রাগে ফুল্‌তে থাকে। সোহাগী আবার বলে,

—বলি কানের মাথা খেয়েছিস্? কথাটা কানে যাচ্ছে নাই না কি?

—দেহ খারাপ।

যেন একটা হুঙ্কার ছাড়লো জাফরুল। সোহাগী ভয় পায়। হয়তো দেখতে পায় জাফরুলের বুকের ভিতর ঘুমন্ত অজগরটা ফুঁসছে। তাই পালিয়ে যায়। দরজার দিকে কটাক্ষ হানে জাফরুল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর ভিতরে রাগের ধূনীটা জ্বল্‌তে থাকে।

*　　　*　　　*

সেদিনই সকাল থেকে বৃষ্টি। রাতেও থামেনি।

এক ঝটকায় কাঁথাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে পড়লো জাফরুল। চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বালা-পোড়া করছে। মনের ভেতর হাঙ্গরটা আজ পাক খেয়ে উঠেছে। তাড়ির কলসী থেকে ঢক্ ঢক্ ক'রে খানিকটা আগুন গিলে যেন দম ছাড়ে জাফরুল। ছেঁচা বাঁশের দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে এলো। ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে।

কাদায় চলতে গিয়ে পা বসে যাচ্ছে জাফরুলের। শব্দ হচ্ছে ছল্, ছল্। গায়ে জলের ঝারা এসে যেন বুকের ভেতরের ধূনীটাকে ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছে।

বাবরি মাঝির ছেঁচা বাঁশের কুঁড়ে। এখানে দাঁড়ালো জাফরুল। বাঁশের বাকারীর জানালার পাশে। পট্ পট্ ক'রে প্যাকাটির মতো গুঁড়োমারি ক'রে ফেল্‌লো জানলাটা।

—একবার পেলে, দুহাতে ডলে, পিষে...। শালীর নিকুচি করেছে। ঘরে ঢুকে পড়েছে জাফরুল। কার গায়ে পা ঠেকতেই জাফরুল

ঝাঁপিয়ে পড়ে সবল হাতে। তার এক বছরের খিধে আজ সে মিটিয়ে নেবে। চোখের আগুনে যেন কামান্ধ পশুটা গর্জন ক'রে উঠ্‌লো।

—শালী, এইবার...

দুহাতে জাপটে ধরতেই, কোথা থেকে দুটো শক্ত হাত সাঁড়াশীর মতো জাফরুলের টুঁটি টিপে ধরলো। জাফরুল চোখে অন্ধকার দেখছে।

তাড়ির ঝোঁকে তবে কি সে বাবরি মাঝির ঘরে ঢুকেছে?

দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি। বাবরি চীৎকার করে।

—ডাকাত, চোর...চোর...

কোনরকমে পায়ে ক'রে বাবরি মাঝির পেটে এক লাথি দিতেই জাফরুলের টুঁটি থেকে হাত দুটো খ'সে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যে জান্‌লা টপ্‌কে জাফরুল ছপাৎ ক'রে বাইরে এসে পড়্‌লো।

ততক্ষণে সোহাগী, সোহাগীর মা উঠে পড়েছে। আলো নিয়ে ছুটে এল। বাবরি তখন পেটের ব্যথায় যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

সোহাগী এক ছুটে বাইরে এসে জাফরুলের কুঁড়ের সামনে দাঁড়ালো।

—জাফরুল, জাফরুল।

সাড়া না পেয়ে বেড়ার দরজা ঠেলে ঢুকতেই সোহাগী সব বুঝতে পারলো। ফিরে আসতেই মা শুধুলো,

—জাফরুল উঠ্‌লো?

—না। শরীর খারাপ, ঘুমুচ্ছে। এইতো কিছুক্ষণ আগে এসেচে বেচারা।

ঘুমোক, শরীরটাও ভালো নেই বলছিলো। আমি বাবার পেটে তেল মালিশ ক'রে দিচ্ছি।

একটা মিছে কথা বল্‌লো সোহাগী।

তারপর আরও একটা মিছে কথা বলতে হ'য়েছে সোহাগীকে। পরদিন যখন জাফরুলকে পাওয়া গেল না, তখন।

—ভোরবেলায় জাফরুল তিনটার রেল ধরবে ব'লে বেরিয়ে গেছে। মা, না বাবার কার অসুখ ক'য়েছে। আমিই তাকে গোটা কতক টাকা দিয়েছি। তোমাকে আর উঠোইনি।

সোহাগী তার বাবাকে বলে।

তারপর রাফরুল আর আসেনি। বাবরি মাঝি আক্ষেপ ক'রেছে ছোঁড়াটার জন্যে।

এরপর বেশ কয় বছর কেটে গেছে। সোহাগীর বিয়ে হ'য়েছে চর-হোগলার জোয়ান মাঝি ভুবনের সঙ্গে। দামোদরের চর জেগে হোগলার বন। তাই চরহোগলা। এখানেই মাঝি মাল্লাদের ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ে-গুলো নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এই চর হোগলার মস্ত জাগ্রত দেবী চরবিবি। সোহাগীর বিয়ের এক বছর ঘুরতেই বিবির থানে এসে ধুনী জ্বালিয়ে বসলো এক সাধুবাবা।

সোহাগীর একটা ছেলেও হ'য়েছে। সোহাগী তাকে নিয়ে মেতে থাকে। লক্ষ্মীগঞ্জের মেলার টুকরো ঘটনাগুলো তার মনের শ্লেট থেকে ক্রমশ মুছে যেতে থাকে। চরবিবির আস্তানা ঘিরে সাধুবাবার থান। দামোদরের পাড়ের উপর বটগাছটার জীর্ণ কঙ্কাল, নীচে জলের স্রোতে খ'য়ে যাওয়া মাকড়সার জালের মতো শিকড়ের স্তূপ। কিছুটা নদীর পল্‌কা মাটিকে কামড়ে ধ'রেছে আর বাকীটা হাওয়া আর জলের লোভে হ্যাংলার মতো যেন চেয়ে আছে। এই শিকড়ের ঝাঁপির মধ্যেই জটাই-বাবার আস্তানা। তার চুলের জটা—কতকগুলো ঝুঁটি ক'রে বাঁধা, কতকগুলো ঝুলছে পাশে। সে চরবিবির সঙ্গে নাকি কথা বলে। মাঝি মাল্লাদের শীর্নি দেয়। ধুনী জ্বালায়। সেখানের লোকেরা তাকে দেব্‌তা জ্ঞানে ভক্তি করে। বলে,

—জটাইবাবাই হ'লো পীরবাবা। আর চরবিবি ওর মা।

এমনি একদিন সন্ধ্যেবেলায় কাশ আর হোগলার ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল কালোদহে। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। কলসী নিয়ে গা ধুতে এসেছিল সোহাগী।

—সোহাগী।

নিজের নাম শুনে চম্‌কে ওঠে। তাড়াতাড়ি কাপড়ে গা ঢাকে। তাকায়,

—এ কি জটাইবাবা?

—না, আমি জাফরুল !

—জাফরুল, তুমি ?

—হ্যাঁ, তোকে আজও ভুলতে পারিনি !

—সে কি ! তবে তুমি জটাইবাবা নও ?

—না। ওটা বাইরের খোলস, তোকে এই বেশে খুঁজে বেড়াচ্ছি ; চ তোকে নিয়ে যাব…পালিয়ে যাবো।

শিউরে উঠ্‌লো সোহাগী।

—ছিঃ ছিঃ আমার যে সোয়ামী আছে !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লো জাফরুল।

—তোর ছেলেটাকে দেখতে সাধ আছে, কাল যাবি, শীর্নি দেবো।

—যাবো।

পরদিন জটাইবাবার আস্তানায় ভুবনকে আর ছেলেকে কোলে নিয়ে সোহাগী হাজির। জটাইবাবার থানে ছেলেকে শুইয়ে দিতেই ছেলে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করতে লাগলো। জটাইবাবা তার গায়ে ধূলফুল মাখিয়ে দিলো।

…জিন্দা রহো ব্যাটা।

সোহাগীকে একচোখ টিপে ইশারা করলো, ভুবনকে একটু সরে যেতে বললো।

—ওগো, তুমি একটু সরে যাওতো। সাধুবাবা কি বলবে বল্‌ছে।

সোহাগী কাছে এলে জটাইবাবার লুব্ধ চোখ দুটো যেন বিবর থেকে বেরিয়ে এলো। বল্‌লো,

—আজ সন্ধ্যেবেলায় আসিস্। ভুবনের জন্য একটু শীর্নি ক'রে রাখবো লিয়ে যাবি।

ভুবন পায়ের ধূলো নিলো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় সোহাগী এলো। আবছা-অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখা যায় না। কিন্তু বেশ বোঝা যায় সোহাগী সেজেছে ; লক্ষ্মী-গঞ্জের মেলায় দেখা সোহাগীর কোন পার্থক্য ধরা যাচ্ছে কি ? এতো নাকছাবি, কপালে কাঁচপেকোর টিপ, পরনে ছাপা শাড়ী, গাছ কোমর

আঁট-সাঁট বাঁধন। হ্যাঁ পার্থক্য ধরা যায় বৈকি! সোহাগীর সমস্ত দেহ জুড়ে যৌবনের ঢেউ উঠেছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন ঢেউ-এর আছাড়ে আছাড়ে উথাল পাথাল। তাই যে সোহাগীকে দু বছর আগে ধরা যেত না সে আজ ঢেউ-এর ফেনায় ফেনায় ছুটে এসেছে নিজেই। জাফরুলের একান্ত কাছে, তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ছোঁয়ায় মধ্যে।

জাফরুল ধুনীটা নিভিয়ে দিল। সমস্ত জায়গাটা আরও অন্ধকার হ'য়ে গেল। জাফরুল ডাকলো,

—সোহাগী!

—হুঁ!

সোহাগীর স্বর কানে গেল কি গেল না। উন্মত্তের মতো জাফরুল সোহাগীকে জড়িয়ে ধরলো।

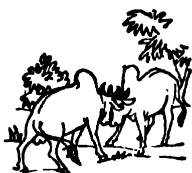
* * *

পরদিন সবাই দেখ্‌লো।

ভুবন তার কুঁড়েতে মরে পড়ে আছে, পাশে শীর্নির বাটি। সোহাগীর ঘর খোলা হাঁ হাঁ করছে। সোহাগী নেই, তার ছেলেটাও নেই।

আর দেখ্‌লো চরবিবির জটাইবাবার ঝাঁপিতে শুধু তার লোটাটা ঝুল্‌ছে। জটাইবাবাও নেই।

আছে শুধু কলমুখর এই মেলা। শান্ত সমুদ্রের বুকে একটি পাথর ছোঁড়ার মত সাময়িক বৃত্তাকার তরঙ্গ। তারপর আবার সেই নির্জনতা—সেই প্রশান্তি। আর পড়ে রইলো বিচিত্র দামোদরের চর হোগলার বন। কাশ আর বেনা। হোগলা আর শরগুলো বাতাসের গোঙানি তুলে চকচকে বালিয়াড়ির বালুকণার সাথে সর্ সর্ আওয়াজ ক'রে যেন ক্ষিধের তাড়নায় অস্থির হ'য়ে ছোটাছুটি করছে।



শাপ

হ্যাঁ, ঐ ত চরটা দেখা যাচ্ছে। জলের স্রোতটা ওখানে কেঁপে কেঁপে উঠ্ছে। বরফির মতো খাঁজ কাটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্রোত। দু' একটা আলোর ফালি টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে এসেছে। খাঁজ কাটা বরফির মতো স্রোতটা। যেন আরও বেশি উচ্ছল, আরও বেশি মুক্তোঝরা হাসিতে ফেটে পড়ছে।

চোখ দুটো চক্ চক্ ক'রে উঠ্লো নবার। নৌকোটাকে লগির গায়ে আটকে রেখে থমকে দাঁড়ালো। এক হাতে লগিটাকে চেপে ধ'রে শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে দিলো নবা।

—হ'লো কি?

—থামলে কেন?

—এই মাঝি!

আচমকা কলরব ক'রে উঠ্লো সবাই।

ফিরতি প্যাসেঞ্জারের ঝড়তি-পড়তি। দুজন খালি ঝাঁকা নিয়ে, আর জন-তিনেক খালি চুবড়ি নিয়ে। তরকারী আর মাছের। বর্ধমানে মাল বিক্রি ক'রে ফিরছে। আর একজন শেষ বাসের প্যাসেঞ্জার। সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে। একজন মুটে। তারই।

ঘাবড়ে গেল সেই-ই বেশি। থতমত খেয়ে খেঁচিয়ে উঠ্লো।

—বাসটা ফেল করবো যে, সে খেয়াল আছে?

না। নবার খেয়াল নেই। ধনুকের মতো দেহটা বেঁকে র'য়েছে এখনো। চোখ দুটো ভাঁটার মত জ্বল্ছে। ডান পা-টা কাঁপছে।

—এ নবা, আবার খেপামী জুড়েছিস?

—আরে নৌকোটা যে ঘুরছে?

—এ মাঝি ?……

—ওহে শালা লটবর…হাউ চাউ ক'রে উঠ্‌লো সবাই।

লগির গায়ে নৌকোটা আঠার মতো চিটিয়ে গেছে। চরের মাঝে খাঁজ কাটা ঢেউগুলো ছপ্‌ ছপ্‌ ক'রে এগিয়ে চলেছে। নৌকোটাকে কে যেন দম দিয়েছে। বোঁ বোঁ ক'রে চরকির মতো ঘুরছে লগির চারদিকে। একটা বিরাট ড্রাগন যেন তার মুখের প্রকাণ্ড গহ্বরে শিকার এনে ফেলছে। অধীর আগ্রহে আর উন্মাদনায় সে কাঁপছে। কেবল উন্মত্ত রসনায় লেহন ক'রে স্বাদ নিচ্ছে, তারই শব্দ—চুক্‌-চুক্‌-চুক্‌।

—শালা আবার হাঁ ক'রেছে, শালার মুখে মারি…

নবা যেন মরীয়া। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাঁক খাওয়া ধনুকের মতো দেহটা লগির গলায় ঝুলে পড়লো। আর লগিটাও ধনুকের মতো বেঁকে জলের স্রোতে আর নৌকোর ঘায়ে কাঁপতে লাগলো।

—শালা, মাথায় বরফ চাপিয়ে পড়ে থাকগে, ভীমরতি ধ'রেছে!

হালের গই থেকে হুঁকোটা রেখে বিদ্যুতের বেগে ছুটে এলো পরাণে। বুড়ো কর্তা। লগিটা শক্ত হাতে বেঁকিয়ে ধনুকের পিঠে মারলো এক ঘুঁষি।

—ছাড় শালা—, ভর সন্ধ্যে ভীমরতি ধরলো আবার ? আসিস্‌ কেনে লোকো বাইতে ?

আবার ঘুঁষি। বাঁক খাওয়া ধনুকটা যেন ছিনে জোঁকের মতো লগিতে ঝুলছিলো। ঘুঁষি খেয়ে লগি থেকে ছিট্‌কে পড়লো নবা। একেবারে হালের পাশে গই-এর ভিতর।

পরাণবুড়ো শক্ত হাতে লগিটাকে গেঁথে টাল খাওয়া নৌকোটাকে থমকে দিলো। স্রোতের মুখে একবার মাত্র স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো নৌকোটা। তারপর শক্ত হাতের লগিতে তর্‌ তর্‌ ক'রে এগিয়ে চল্‌লো।

মাথায় হাত দুটো চেপে ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো নবা। হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে রইলো। আর চাপা কান্নার রুদ্ধ আবেগ ফেটে বেরুতে লাগ্‌লো।

—পাগল না কি ?

আদ্দির পাঞ্জাবি লোকটি এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লো।

—পাগল বটেক বাবু। এই চরবাবার থানে এলেই উটোর যে কি হয়! পরাণবুড়ো উত্তর দিলে।

সন্ধ্যের ভয় থম্‌-থম্‌ আব্‌ছা জ্যোৎস্নায় ঘেমে উঠেছিল সবাই। পরাণবুড়োর শক্ত হাতে টাল খাওয়া মাতাল নৌকোটা বশ মানলো। বরফির খাঁজ কাটা ঢেউগুলো নৌকোর গায়ে আছড়ে টুকরো টুকরো ফুলঝুরি হ'য়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার মিষ্টি আলোর ক্ষণিক ঝলকানিতে সবার মুখ-চোখ দূর আকাশের নক্ষত্রের আলো হ'য়ে মিট মিট করতে লাগলো। যাত্রীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

* * *

দামোদরের বুকে পাল্লা অনেকবারই দিয়েছে নবা।

ভরা গাঙের উত্তাল তুফানে, আর মরা স্রোতের চর জাগা টানে। সব কটি ঋতুর বিচিত্র দামোদরের সঙ্গে নবার পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু এমনি কোন এক আবছা আলোর আয়নাতে সে চর ভাঙা স্রোতের ছপ্‌-ছপানি সহ্য করতে পারে না। ঐ বরফির খাঁজ কাটা মুক্তো জ্বলা ঝল্‌-কানিতে সে আরও বেহুঁস, আরও উন্মত্ত হ'য়ে যায়। ওর ভাঁটার মতো চোখ দুটো বার কতক ঘুরপাক খেয়ে স্থির হ'য়ে যায়। মরা স্রোতের তলায় চরের বুকে ও কি যেন দেখতে পায়। ওকে জোর ক'রে হুঁস্‌ করিয়ে দিতে হয়, নইলে ভূত চেপে বসে। ঘাড় থেকে ভূতটা নেমে গেলে ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তখন দুর্দ্দান্ত নবা মাঝি—অসহায়, নিঃসঙ্গ। বড়ই দুর্বল। বাপ মা আদর ক'রে নাম রেখেছিল—নবকুমার।

কিন্তু সংক্ষিপ্ত দামোদরের তীরভাঙ্গা ক্ষণস্থায়ী জীবনযাত্রায় নামটাও ছোট্ট হ'য়ে গেছে। তাই থেকে মূল নামটা ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে 'নবায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাতে কি? কাল্‌চে রঙের উপর জৌলুষের খেলা, পেশীর ভাঁজে ভাঁজে উজ্জ্বলতা ফুটে বেরুচ্ছে।

লগি ধরতে শিখে পরোয়া করেনি কাউকে। ঘাটবাবুর কাছে সেই প্রথম দিন টিপ ছাপ দিয়ে খাতায় যা নামটা লিখিয়েছে। আর যায়নি কোনদিন। বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপটা দেখে সে হেসেছিলো। আর নৌকোয় এসে লগির গায়ে কালিটা পুঁছতে পুঁছতে বলেছিলো,

—হুঁ যত সব ভেল্কিবাজি···পীরপালাম···চরবাবা !

কিছুতেই যেতে চাইনি নবকুমার।

—আমার হাতে শক্তি, আমার কব্জি...আমার খ্যামতায় লগি চল্‌বে। তাতে পীরপালাম কে? চরবাবা কে? ছঃ যত্তো সব··· ধোঁকাবাজি !

সকাল থেকেই বাপ তাড়া লাগিয়েছিলো। পীরপালামের ধুল-ফুল মাথায় বুলিয়ে দিয়ে বললো,

—যা পেন্নাম ক'রে আয়।

—আমার ওসব ভালো লাগে না হুঁ।—তোমাদের যত্তো সব।

—মস্করা রাখ লবা।

হুঁকো হাতে বাপজান ঝাঁঝিয়ে উঠ্‌লো।

অগত্যা নবাকে যেতে হ'লো। দূর থেকে পীর পালামের পোড়ো-মাটির ঘোড়া আর হাতীগুলোকে দেখে ওর যেন একটু করুণা হ'লো। জিয়ল গাছের তলায় বাবার আস্তানা। স্তূপীকৃত মাটির উপর পোড়া-মাটির ঘোড়া, হাতী ও আরও হরেকরকম মূর্তিতে জায়গাটা ভ'রে গেছে। চারদিকে বাঁশের বাখারী দিয়ে বেড়া দেওয়া। একেবারে গা ঘেঁষে দামোদর চ'লে গেছে। হাজার বছর ধ'রে নাকি অনেক তীর ভেঙ্গেছে, কিন্তু পীরপালামের এক কণা মাটিও খসেনি। কেবল আস্তানার মাঝখান থেকে একটা ফাটল নদীগর্ভে এসে মিলিয়ে গেছে।

হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো নবা।

—পীরবাবা তোমার হ'য়ে এয়েচে। এই সময় বাবা তোমার হাতী ও ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে রাস্তা দেখ। নইলে এই বর্ষাতেই তোমার দফা গয়া।

—লবা···হো···ই ; বাবা হাঁকছে।

তাড়াতাড়ি একটা পেন্নাম ঠুকে ঘুরে দাঁড়ালো নবা।

—ঐ লদীর বুকে চরবাবাকে পেন্নাম ক'রে আয়।

দারুণ বিরক্তি নিয়ে নবা নদীতে নামলো। হাঁটু জল পেরিয়ে চর-বাবার থানে গিয়ে উঠ্‌লো। পিছন ফিরে দেখে, বাপজান এখনো দাঁড়িয়ে র'য়েছে।

কাশ আর বেনা ঝোপে ঢুকে পড়লো নবা। একটা সরু রাস্তা সর্পিল গতিতে এগিয়ে গেছে। রাস্তাটা যেখানে শেষ হ'য়েছে—সেটাই চরবাবার থান। বর্ষায় ডুবে যায় কিন্তু জল কমে গেলে চরবাবা আবার জেগে ওঠে। কাশ, বেনা আর হোগলা ঝোপ তখন চরবাবার একমাত্র সঙ্গী।

হ্যাঁ। ঐ ত—ঐখানেই রাস্তাটা এসে যেন থমকে গেছে।

গোলমতো খানিকটা জায়গা। ঐটাই বাবার থান। বালি আর পলি মাটিতে কিন্তু বাবার থানটা সিমেণ্ট বাঁধানো চাতালের মত শক্ত।

নবা দাঁড়ালো এক মুহূর্ত্ত। জলে ভেজা পাতার একটা বুনো গন্ধ নাকে এসে লাগছে। তার সঙ্গে ভিজে পলির সোঁদা গন্ধ। শর, কাশ আর বেনা পাতাগুলো যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি কানাকানি স্থুরু ক'রে দিল। কোথায় যেন অস্পষ্ট একটা গোঙানি ভেসে আস্‌ছে। নবার একটু গা ছম্ ছম্ করলো। ঘেমে উঠেছে ও।

—কু-ঈ-ঈ-ঈ ক...

ডানা ঝটপট ক'রে একটা বাদুড় উড়ে গেল। দূরে স্থুর মিলিয়ে একটা কুকুর ডাকলো, ঘেউ···ঘেউউ···ঘেউউ···

অট্টহাসির হাসি হাসলো নবা। হো···হো···হো···

নদীর ওদিকে বোধহয় বাপজান ডাকছে,

—ন—বা···ন···বা···হোই ··

—হুঁ চরবাবা, না ছাই—। যত্তো সব—

ব'লে শক্ত পলিমাটির চাতালে দিলো এক গোড়ালি। ভস্ ক'রে খানিকটা মাটি নেমে যেতেই ডানদিকের পাছায় একটা খেঁচকা লাগলো।

—ও বাবা। চরবাবার চোরা পথ না কি? আমার কিন্তু দোষ নাই বাবা। তোর ঘোড়া নেই, হাতী নেই। পেন্নাম ঠুকতে মন লিচ্ছে না, একমুঠো পলি নিয়ে ছুটলো নবা। দুরন্ত দুর্মদ নবা, শর আর কাশ, হোগলা আর বেনার ঝোপ দুমড়ে...ভেঙ্গে···লাফিয়ে উন্মত্তের মতো ছুটে চললো। আঁতকুলার যাত্রা দলে শোনা গানটা ডাক ছেড়ে গেয়ে উঠ্‌লো,

"ও আমার পরাণ পাখিরে—

সে সব কথা আজও মনে পড়ে। গই-এর কাছে ব'সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে নবা। সেই আবছা দিনগুলো নবাকে ঘিরে ধরে, হাত-ছানি দিয়ে ইশারা করে। নবা দিশেহারা হ'য়ে যায়।

নৌকোটা ঘাটে এসে লাগে। যাত্রীরা চলে যায়। ঘাটবাবু হেজাক আলোটা আনে। নৌকোটো খুঁটোয় বেঁধে পরাণবুড়ো নবাকে তুলে আনে,

—চ, কেঁদে আর কি করবি? ও তো আর মানুষের হাত লয়। অনেক কব্‌রেজ তো দেখ্‌লে?

নবাকে পাঁজকোলা ক'রে তুলে আনে পরাণ। নবার ডানপায়ের খেঁচ্‌কাটা আবার জানানি দিয়েছে। বাঁ পা-টা মাটিতে ঠেকিয়ে খুঁড়িয়ে চল্‌লো।

নদী থেকে উঠেই পীরপালামের থান।

—বস্‌ এখেনে। বাবাকে ডাক্‌। আর কি করবি বল্‌ দেখি?

পীর পালামের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে নবাকে নামিয়ে দিয়ে পরাণ চলে গেল। এবার নবা হু হু ক'রে কেঁদে ফেল্‌লো। ডান পা থেকে কোমর পর্যন্ত একটা শিরা রোজকার মতো ফুলে উঠেছে। যন্ত্রণা হচ্ছে। পা-টা মাটিতে রগড়াচ্ছে নবা, আর অস্ফুটে গোঙাচ্ছে। সহ্য করতে না পেরে শুয়ে পড়লো। রগ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

আজ সব মনে পড়ে নবার। সেই দুর্বার যৌবন কোথা গেল? সেই অসুরের শক্তি? সেই মনের জোর? হাল ধরবার দিন নদীর বুকে সেই বাজি ধরা! একটা পানসিকে দু'হাতে ক'রে উল্টো, পাল্টা, তেপাল্টা গড়িয়ে দিয়েছিল নবকুমার, সে আজ মরে গেছে। তার বাইরের খোলস্‌টা কেবল একটা মৃতকায়ার উপর আচ্ছাদন দিয়ে বেঁচে আছে। আর নিষ্ঠুর ভাগ্যের লিপি তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সে আজ পঙ্গু···উন্মাদ···। আর কিছু ভাবতে পারে না নবা।

—বাবা পীরপালাম, আর যন্তনা সইতে লারছি। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।

আর্ত্তনাদ ক'রে পা-টা পীর পালামের থানে ঠুক্‌তে লাগলো নবা। একটা লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে সে এসে দাঁড়ালো।

নবা চোখ মুছে তাকালো। ময়না। তার ময়লা কাপড়ের আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে। আলোটা রেখে ময়না এগিয়ে এসে বাবাকে পেন্নাম করলো গড় হ'য়ে। তারপর খানিকটা ধূলফুল নিয়ে নবার ডান পায়ে ঘষ্‌তে লাগলো।

—আবার তুমি ঐ চরে গেছলে?

কোন উত্তর দিলে না নবা। চোখ দুটো কেবল মুছ্‌লো।

—কি সাড়া দিচ্ছ না কেনে? এবার যদি কোনদিন যাও তবে আমার মাথা···

—আঃ ময়না চুপ কর্‌ তুই···

—কেনে চুপ করবো? তোমাকে কতদিন ব'লেছি। অসুখটা বাড়িয়ে আমাকে সাজা দিতে চাও লয়?

—আমাকে একটু ধর্‌। উ ভালো হ'য়ে গিছে। উটো কিছু লয়! ময়নার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে পড়ে নবা।

একবার পিছন ফিরে পীরবাবার থানটা ভালো ক'রে দেখে নেয়। পোড়া মাটির মূর্তি, ঘোড়া আর হাতীগুলো স্তূপীকৃত হ'য়ে জিয়লগাছের কোলে কালের সাক্ষী হ'য়ে র'য়েছে। মাঝে মাঝে দুটো একটা আগাছা পীর পালামের থানটিকে কেমন যেন সাজিয়ে দিয়েছে। জিয়লগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফালি ফালি জ্যোৎস্না স্থানটিকে রমণীয় ও মায়াময় ক'রে তুলেছে। বনতুলসীর একটা মাদক গন্ধ, পলি মাটির সোঁদা আস্বাদ, দামোদরের তীর-ভাঙ্গা মরা স্রোতের কল্‌-কলানি—সব মিলিয়ে যেন এটা একটা সৃষ্টির ব্যতিক্রম।

আর এটাই বুঝি বাবা পীর পালামের শোভা। পলি মাখা হাত দিয়ে চোখটা মুছলো নবা। আজও তার সেই সব কাহিনী মনে আছে। মনে আছে বিয়ের দিনটা।

গৈতানপুরের নবকুমারের পাশে দাঁড়িয়ে ঘোমটা দিয়ে মোহনপুরের মেয়ে ময়না। বরণ করার সময় ঠাট্টা মস্করা ক'রে ফাঁদে ফেলেছিলো নবাকে। নবাও শক্ত আর সবল হাতে বরণের ডালা আটকে দিতেই—বৌ ঝিউরিরা সব হৈ-হৈ ক'রে উঠ্‌লো।

—ও মা ! এ আবার কি কাঠগোঁয়ার ঠাকুরপো গো…ফিক্ ক'রে হেসে আবার চাপতে না পেরে ফিক্ ফিক্ ক'রে পাশের ঘোমটাওয়ালী হেসে উঠ্‌তেই ভাঁটা চোখে গজরাতে থাকে নবা।

ঝামেলা চুক্‌তে মা'কে বললো নবা,

—চরবাবার থানে বউকে পেন্নাম করিয়ে আনি।

বাবা মা সবাই খুশি।

নৌকোয় বউকে চাপিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চল্‌লো নবা– নানা কসরত আর কেরামতিতে। ময়নাও মাঝির মেয়ে। তবুও অবাক হ'লো। হাসলো দুজনেই। প্রাণ খুলে কথা বল্‌লো, নবার জীবনের সব…সব কথা। যেন এক সঙ্গে ব'লে এক নি:শ্বাসে শেষ করতে চায়। বেলা প্রায় ডুবুডুবু। ময়না বললে,

—চরবাবা ?

সেই পায়ে চলা পথ। দুজনে হেঁটে চরবাবার থানে এলো। ময়না গড় হ'য়ে পেন্নাম করলো। কাপড়ের খুঁটে এক খাব্‌লা পলি বেঁধে নিলো।

—কই পেন্নাম করো। ময়না অবাক চোখে তাকায়।

—দুত্তোর চরবাবার নিকুচি ক'রেছে। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। নদীর মাঝে চর। আর সেটা হ'লো ঠাকুর ! যত্তো সব–

—ও মা ! ওকি ! ও কথা ব'লোনি, আমার বাপু গা শির শির করছে।

—এই দেখ, এই দেখ।

ব'লে ডান পা-টা দিয়ে চাতালেএকটা লাথি মারলো নবা। পা-টা একটা চোরা গর্ত্তে অনেকটা ঢুকে যেতেই ময়না কেঁদে উঠ্‌লো।

—ও মা কি সব্বোনাশ, পালিয়ে এসো।

ময়না নবাকে টানতেই নবা পড়ে গেল চিৎ হ'য়ে। ময়না ককিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু নবা হো…হো ক'রে হেসে ময়নাকে জড়িয়ে ধরলো।

—এসব ভেল্কিবাজি…বুঝ্‌লি ?

—যাও যত্তো সব ইয়ে…

ছুটে পালিয়ে গিয়ে ঘেঁটু ফুল তুলতে লাগলো ময়না। মাথায় গোটা দুই গুঁজে নিয়ে শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিলো। ডান পা-টা ঝাড়তে ঝাড়তে নবা ছুটলো। ময়নার হাত থেকে ঘেঁটু ফুল কাড়তে।

হেসে গড়িয়ে পড়ে ময়না। এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে। ধরতে পারে না নবা। এক সময় নদীর চর ছাড়িয়ে ফাঁকা বালিয়াড়িতে এসে ওরা পৌঁছুলো। সে-দিন রাত্রের কথা মনে আছে। পাশে ঘুমন্ত ময়না। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা। মোহনপুরের চঞ্চলা দুরন্ত রেখাটি আজ গৈতানপুরের দামোদরের কোলে একটা স্থির বিন্দু। মাঝ রাতে ডান পা-টা কন্ কন্ ক'রে উঠ্‌লো নবার। একবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছেঁচা বাঁশের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো নবা। কিন্তু একি? কে যেন একটা ধারালো ছুরি দিয়ে কোমর থেকে পায়ের চেটো পর্যন্ত চিরে ফাল ফাল ক'রে দিচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পা-টা টান্‌তে টান্‌তে ঘরে ফিরে এলো নবা।

—ময়না...ময়না...

উঁ...

—এই ময়না। উঃ ..

ঠেলে নড়িয়ে দিতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো ময়না। পিদিমটা উস্কিয়ে দিলো।

—ওমা, এ কি? কি হ'লো পায়ে?

—একটু তেল গরম ক'রে আনতো। সাত তাড়াতাড়ি খোয়া জ্বালিয়ে তেল গরম করলো ময়না। পায়ে গরম তেল মালিশ করতে লাগলো।

—কেন এমন হ'লো? ময়নার চোখে আকুতি।

—কি জানি রে! উঃ অসহ্য যন্ত্রণা! মনে হচ্ছে, কোন্ শালা চাকু চালাচ্ছে!

—দেখ। বাবার থানের সেই গর্তে কিছু হ'লো না তো?

—না...না। ওসব কিছু নয়।

বাধা দিয়ে হাঁপাতে থাকে নবা।

একটু পরে আবার সেরে উঠ্‌তেই ময়নার গলা জড়িয়ে ধ'রে হো... হো...ক'রে হেসে উঠেছিলো।

—ওসব ভেল্কি...ভেল্কিবাজি, বুঝলি?

—তাই নাকি? ও-মা, কি মানুষের হাতেই পড়েছি। এমন ভেল্কি ও আবার করতে পারে। আমি মনে করি, কি, না কি?

যন্ত্রণা ভুলে যেতে চায় নবা। দেহে অসুরের শক্তি। রক্তে নাচন লেগেছে। কোথায় কোন নগণ্য চরবাবার চোরা গর্ত্তে তার ভাগ্যের রেখা মুহূর্ত্তের জন্য বাঁক নেবে—তা ভাবতে পারে না নবা। দুরন্ত দামোদর। তার সাথে পাল্লা দিতে হবে। নদীর চর আর ঘূর্ণি, কাশ-বেনার ইশারা, শর আর হোগলার হাতছানি—বন্যার. জলে তীরভাঙ্গা ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ। এর নেশায় তাকে মাতাল হতে হবে।

ময়নার মুখের দিকে তাকায় নবা। আব্‌ছা প্রদীপের আলোয় মুখখানি উজ্জ্বল। তার সারাজীবনের সঙ্গী। সুখের দুঃখের। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ময়নাকে! এলোমেলো চুল। সিন্দুরের টিপটা কপালের একপাশে বল্লমের মতো খোঁচা হ'য়ে র'য়েছে। নাকে চিবুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম, গলায় একটা সস্তা রোল্ডগোল্ডের হার। কাপড়টা আলুথালু, হাতে গরম তেলের পোঁচ। মুখে অবাক চাহনি।

—কি অমন ক'রে দেখ্‌ছো বলোত?

—তোকে, কত্তো ভালো তুই—

—যাঃ

কাপড় গুটিয়ে উঠে পড়লো ময়না। মাঝ রাতে যত সব...

খপ ক'রে ধ'রে ফেললো ময়নাকে। এক হ্যাঁচকায় কাছে এনে বললো,

—আজ আর ঘুমুচ্ছি না। আজ তুইও জাগবি।

ব'লে একরকম টানতে টানতে ঘর ছেড়ে উঠোন, উঠোন ছেড়ে মাঠ, মাঠ ছেড়ে একেবারে নদীতে নিয়ে এলো ময়নাকে। ময়নাকে দুহাতে ধ'রে লোফালুফি করতে লাগলো। ময়না ভয়ে জড়োসড়ো।

—এই…এই কি হচ্ছে ? আমার ভয় করছে…

—ভয় ? মাঝির মেয়ের আবার ভয় ?

তীর থেকে এক লাফে একটা পানসিতে উঠ্‌লো নবা। পানসির দড়িটা খুলে গই-এর মধ্যে রাখা তাড়ির ভাঁড় থেকে এক ঢোক পাঁচুই খেয়ে গরম হ'য়ে নিলো। তর্‌তর্‌ ক'রে নৌকো চালিয়ে চীৎকার করলো, তোর চরবাবার কাছে যাচ্ছি। দেখি শালার কি আছে বনে…, ময়না তীরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো। দূর থেকে নবার গান ভেসে আসে :

ও আমার পরাণপাখী ময়না,
কথা কেনে কয় না—

সে সব মনে পড়ে। বিয়ের কনে ময়না সারারাত নদীর ধারে ব'সে কাটিয়েছিলো। ভোর রাতে নবা ফিরে এলো, গায়ে জ্বর। মাথায় গায়ে হাত দিয়ে কেঁদে ফেলেছিলো ময়না।

—কেন তুমি রাতে লৌকো চালাতে গেলে ?

সে সব মনে আছে। তার যৌবন আজও অটুট। কিন্তু পঙ্গু হ'য়ে গেছে মনটা। মাঝে মাঝে যখন সে তার হারানো শক্তি ফিরে পায়। তখন মনে হয় সেই গর্ত্তটায় গোটাকতক লাথি মেরে গায়ের জোরটা বুঝিয়ে দিয়ে আসে।

কিন্তু না। ময়না দিব্যি দিয়েছে। তার বাবা, তার মা—এদের সুখের সংসার দেখে গিয়েছে। হাসিতে আর গানে উচ্ছল ছিল নবা। ঘরে সান্ত্বনার ছোট্ট প্রদীপ ময়না।

লণ্ঠনটা রেখে বিছানায় শুইয়ে দিলে নবাকে। তেল গরম ক'রে পা-টা মালিশ করতে লাগলো। খানিকটা আরামবোধ করলো নবা। পায়ের ওপর দু ফোঁটা চোখের জল পড়তেই বুঝলো, ময়না কাঁদছে। বাঁ হাতে ময়নার চিবুকটা তুলে ধরে নবা।

—কাঁদছিস্‌ ? ও কিছু লয়। ভালো হ'য়ে যাবো দেখবি। আবার লৌকো চালাবো। আবার লগি ঠেলবো।

হাঁপাতে থাকে নবা।

কিন্তু আর ময়নাকে ঠকাতে পারেনি ও। বিয়ের রাতের পরদিন সেই চরবাবার থানে এসে সে একবার মাত্র ঠকাতে পেরেছিলো ময়নাকে। ভেল্কি ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু আর পারেনি। তবু চুপ ক'রে থাকে ময়না। যদি তাতেই ও আনন্দ পায় পাক। নবার অজান্তে চরবাবার থানে গিয়ে মানত ক'রেছে ময়না। একদিন হত্যে দিয়ে পড়েই ছিলো। ঘুমন্ত নবার পায়ে চরবাবার ধূলফুল মখিয়ে দিয়েছে। কতো কেঁদেছে নির্জনে। কিন্তু কই? অতবড়ো জোয়ান পুরুষটা এতটুকু হ'য়ে যায়। যন্ত্রণায় পঙ্গু, অসহায়, দুর্বল নবা। মনে হয় কে যেন একটা ধারালো বল্লম দিয়ে খোঁচায়। দু একদিন যন্ত্রণাটা থাকে। আবার সেরে উঠলেই নবা কিন্তু সেই বিশ বছরের জোয়ান।

মা আর বাবার মৃত্যুর পর নবা কিন্তু কাঁদেনি। ওদের সুখের সংসার দেখে গেছে তারা। তারা দেখে গেছে, তাদের ছেলে জোয়ান, দামোদরের সেরা মাঝি। ময়না যথার্থই মাঝির বৌ। নবার এ অসুখ আর লুকেনো নেই। ময়না ধ'রে ফেলোছ। তাই চোখের জলে কতো কি মানত ক'রে নবার পঙ্গু পায়ে ধূলফুল মাখায়, মাদুলী বাঁধে, বাবার চানজল খাওয়ায়। নবাকে শাসন করে, অনুযোগ করে ময়না।

যেদিন নবা জানতে পারলো, তাদের ঘরে দীর্ঘদিন বাদে একজন নতুন সঙ্গী আসছে, সেদিন লুকিয়ে পীরপালামের কাছে গিয়ে দুদণ্ড ব'সেছে নবা। যেন মনের কত কৃতজ্ঞতার কথা জানাবার ছিলো। সকাল সকাল চান ক'রে হাঁটুজল পেরিয়ে চরবাবার থানে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থেকেছে। কেঁদেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে গর্ত্তটার পলি নিয়ে পায়ে মেখেছে। একটি কথাও বলেনি। তার কতো আবেদন যেন না-বলার বেদনা হ'য়ে ঝরে পড়েছে। হয়তো বলতে চেয়েছিলো।

—বাবা, তুমি আমায় ছেড়ে দাও...আমায় একটু বাঁচতে দাও। এই দেখ তোমার কাছে ছুটে এসেছি। কিন্তু কে তার সাক্ষী? ঐ চরবাবা, ঐ কাশ, বেনা, শর, হোগলার ঝোপ।

ঘাটবাবুই ঠিক ক'রেছিলো। নবার পায়ে বাত ও টিকিট আদায় করবে। টিকিট দেবে। লৌকো বাইতে হবে না, খাটনি কম। তাই প-টা বেশি কষ্ট দেয় না আর।

ময়না নতুন সঙ্গীর অপেক্ষায় দিন গুণছে। একমাস একমাস ক'রে এগিয়ে আসছে।

বর্ষায় দামোদর বিচিত্র। দু-কূল ছাপিয়ে বন্যার জল দিগন্তের কোল থেকে ছুটে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকেই বৃষ্টি। এক নাগাড়ে। চারদিকে জল থৈ থৈ করছে। চরের কাশফুলগুলো শুধু জেগে রয়েছে। বাকী যেদিকে দৃষ্টি যায়, শুধু জল···আর জল।

সন্ধ্যার সময় ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। উঠতে গিয়ে ময়নার পেটটা কে যেন টেনে ধরলো। নবা একটা জাল বুনছিলো। অস্ফুট শব্দ শুনে বললো,

— কি গো! কিছু হচ্ছে নাকি?

—কিছু না। ভাতের হাঁড়িটা তুমিই নামিয়ে নিও।

ব'লেই মুচকি হেসে ঘরে ঢুকে পড়লো ময়না। ঘর থেকে উঃ আঃ অস্ফুট শব্দ ভেসে আসতে লাগলো।

একবার উঁকি দিয়ে দেখলো নবা।

—ও পাড়ার পিসিকে ডাকবো?

— তাই যাও, তাড়াতাড়ি। যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছে ময়না।

পেখে মাথায় লণ্ঠন নিয়ে ছপাং ছপাং ক'রে চললো নবা। একবার দামোদরের দিকে তাকালো। জল কল্ কল্ ক'রে ফুলে ফেঁপে উঠছে। যেন রাত্রের মধ্যেই গোটা পৃথিবীকে ছোবল মারবার জন্য বিরাট মুখ-ব্যাদন ক'রে একটা অজগর কোটি কোটি অজগরের মূর্তিতে ফুঁসে উঠছে, কোথায় একটা ধস নামার শব্দ হ'লো। ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে তার অস্ফুট গোঙানিটা বড়ই করুণ মনে হ'লো।

পিসি এসে চেঁচিয়ে উঠলো।

নব, নব,—

— কি পিসি?

—বউ অজ্ঞান হ'য়ে র'য়েছে, জ্ঞান নেই—

—কি হবে পিসি? কেঁদে উঠলো নবা। চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো।

—তুই দাঁড়া। হারু বদ্যিকে ডাকি। পিসি ছুটলো।

কেঁদে উঠ্লো নবা। লুকিয়ে কাপড়ের খুঁটে রাখা চরবাবার ধূল-ফুলটা মাথায় ঠেকালো আজ। প্রদীপের সামনে এনে দেখ্লো, কতক-গুলো চকচকে পলি—। সোনালী আলোয় তারা যেন খল্‌খল্ ক'রে হেসে উঠ্লো। ময়নার গায়ে চাট্টি মাখিয়ে দিল। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে,—মাগো… মা…

স্থির থাকতে পারলো না নবা। ময়নার অচৈতন্য দেহটা দুহাতে তুলে নিলে। বর্ধমান হাসপাতালে না গেলে বাঁচাবে ঐ হারু বৈদ্যি? অচৈতন্য ময়নাকে এনে চাপালো একটা পানসিতে। বৃষ্টি কমেছে, কিন্তু শোঁ শোঁ ক'রে বাতাস বইছে। মুহূর্তের মধ্যে লগি ঠেলে তীরবেগে চালিয়ে দিলো নৌকো।

ভরা দামোদরের ক্রূর-কুটিল ফণা বারে বারে ফুঁসে উঠছে। তার মাথায় দোল খাওয়া পানসিটার আশে-পাশে সাদা ফেনা। যেন অজগরটার বিষাক্ত লালা ফেনায়িত হ'য়ে মুখের চারদিকে জমছে। দীর্ঘদিনের ক্ষুধার্ত গহ্বর আজ বিষে জর্জর হ'য়ে শিকার করায়ত্ত করতে চায়।

নবার মুখে রা নেই। বুকে স্পন্দন দুরু দুরু। উত্তেজনায় চোখ মুখ লাল হ'য়ে গেছে। গায়ে বিশ বছরের যৌবন, সবল শক্ত হাতে লগির বুকে প্যাঁচ দিচ্ছে।

দামোদরের বিচিত্রতার সঙ্গে সে আজ একাত্ম। হ্যাঁ, ঐ তো সেই চরবাবার থান। কাশ আর বেনা ঝোপ জলে ডুবে গেছে। শুধু জেগে আছে কয়েক গাছা সাদা কাশফুলের শীষ্, আর কতকগুলো আবছা অন্ধকারে ঝিরঝিরেনি বৃষ্টিতে জলের স্রোতে লেপ্টে গেছে। বুকটা কেঁপে উঠ্লো। পা-টা কি টল্ টল্ করছে? পাছার কাছ থেকে বরাবর ডান পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত শিরাটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই সেই শয়তানটা আবার ধারালো ছুরি চালাচ্ছে। উঃ অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো। একবার নৌকোয় অচৈতন্য ময়নার দিকে তাকালো নবা।

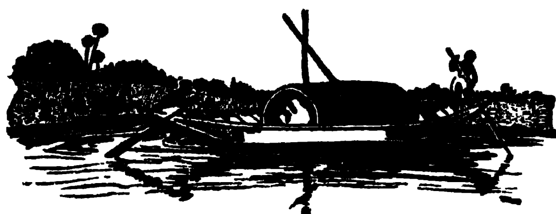
কিন্তু ওকি? নৌকোর চারদিকে সাদা ফেনাগুলো নীল হ'য়ে

যাচ্ছে কেন? বিষাক্ত অজগরটা কি ছোবল দিতে না পেরে বিষ উগ্‌রে দিচ্ছে? উঃ নিঃশ্বাস টানতে পারছে কই নবা। সমস্ত শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। গায়ে যত জোর আছে, তত জোরে ঠোঁটটা কামড়ে রক্ত বার করলো নবা। লগিটা বসে গেছে, উঠ্‌ছে না। পাগলের মতো ঝাপসা চোখে জলের দিকে তাকালো নবা।

হ্যাঁ, ঐ তো সেই বরফির খাঁজ কাটা ঢেউ। যেন মাথায় হীরক-জলা অজস্র ফণিণী ছুটে চলেছে, তাদের নীল গরলে জায়গাটা নীলচে হ'য়ে গেছে। লগিটা ঐ থানটাতেই ব'সে গেছে, আর উঠ্‌ছে না। যেন দাঁত দিয়ে কামড়ে ধ'রেছে। নবা চেষ্টা করছে তুলতে—প্রাণপণে। কি অসহায়! কি দুর্বল!

একটা অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পাগলের মতো ময়নার অচৈতন্য দেহটা তুলে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলো নবা।

বন্যার তীরভাঙ্গা ঢেউ, ধস ছাড়ার শব্দ, অশান্ত ঘূর্ণি আর অজস্র শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দ যোগ হ'লো। বিরাট অজগরের বিবরে শিকার গলাধঃকরণের মতই। দামোদর কি বিচিত্র! কি হিংস্র।



নৌকো

জীবনে যদি গতি দেখতে চান, আসুন দামোদরে। এক সময় দামোদর ছিল দুর্দান্ত, দুর্মদ। আজও আছে। তাকে সংযত করবার জন্য 'বাঁধের' বেড়ি দিয়ে বাঁধা হ'য়েছে। কিন্তু তবু তার ভয়ঙ্কর মূর্তিটা মাঝে মাঝে বর্ষার ভরা বাদরে আত্মপ্রকাশ করে। হাজার হাজার লোক কী নিদারুণ পরিশ্রম ক'রে সকাল সন্ধ্যা এই দামোদর পারাপার হয়! এইসব পারের যাত্রী, কতকগুলো নৌকো, লগি, দাঁড়, হাল, বৈঠা আর নোঙর নিয়ে এখানকার মাঝি মাল্লাদের জীবন। তাদের স্বপ্ন ভালো নৌকো, ভালো লগি, খেয়ার ভালো সাথী। বৃহত্তর পৃথিবীর মানুষ সকাল-সন্ধ্যা এদের খেয়াতে পারাপার হয়, কিন্তু তাদের মনের ছোঁয়া এদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না। ছোট্ট কুঁড়ের প্রেম, প্রণয়, প্রীতি এদের দুর্দান্ত জীবনকেও বেঁধে রাখতে পারে না। বিচিত্র এই পৃথিবী, বিচিত্র এই জীবন!

* * *

ফুলশয্যার রাতেই উঠিয়ে এনেছিল চিকু।

ঘুমাবে না ভেবে চোখ বুজেই শুয়েছিল। কিন্তু নয়নার সংগে গল্প গুজব করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায় নি। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙ্গতেই ঠেলে তুললো নয়নাকে।

—এই···নয়না ওঠ্ ওঠ্···

নয়নতারা পাশ ফিরে শুলো। পরনে বিয়ের সেই কোন আমলের একটা বস্তাপচা পুরানো শাড়ী। নয়নতারা নড়তেই খস্‌খস্ আওয়াজ হয়। বাক্সবন্দী ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা নাকে লাগে।

—এ—ম'লো। ওঠ্ না, এই নয়না ··কথাটা শিচ্ছিস নে?

—উঁ—

নয়নতারা সাড়া দিয়ে আবার পাশ ফেরে। চিকু কিন্তু অধৈর্য হ'য়ে উঠেছে।

—তবে…রে…ব'লেই নয়নাকে কাতুকুতু দিয়ে ওঠাতে চেষ্টা করে। নয়না উঠে পড়েছে? ঘুম-জড়ানো চোখে তাকায়?

—কি হ'লো ওঠালে কেন?

আর একটিও কথা না ব'লে নয়নার হাত ধ'রে চিকু হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে চললো দামোদরের বুকে। আকাশে অগুনতি তারা। নীল ভেলভেটের মেঝেতে যেন কোটি কোটি জোনাকি-দীপ। নীচে মরা দামোদর। শুধু বালি আর বালি। এধারে নির্জীব সরীসৃপের মত প'ড়ে র'য়েছে ক্ষীণ জলধারা। আকাশে চাঁদ নেই। কিন্তু অস্পষ্ট অন্ধকারের আলোতে দেখা যায়. যেন সরীসৃপটা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছে, গায়ে কোটি কোটি চুমকির রোশনি; স্থির অথচ দীপ্যমান। কাঁপ্ছে, নড়ছে, ওঠানামা করছে।

—এই দেখ্, আমার লৌকো। দেখেছিস্ ছুঁচপারা মুখ, এর লেগে শালা মারামারি। সবাই বলে এ লৌকো আমি লোব। ও বলে আমি লোব, এ ব'লে আমি লোব। আমি শালা ঘাপটি মেরে ছিলুম। লটারি হ'লো, আর উঠ্বি ওঠ্ আমার নাম। কি—হাঁ ক'রে কি দেখ্ছিস্?

—তুমি এই লৌকো দেখাবার জন্যে ভর রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে আনলে? নয়নতারা বিরক্ত হ'য়েছে। নয়নতারার চোখ জুড়ে আসছে।

—না তো কি? তোর রূপ দেখবার জন্যে? হো হো ক'রে হেসে উঠ্লো চিকু। গায়ে চিকুর খুব জোর নেই। শরীর পাতলা। বারো বছর বয়সে সেই যে একবার টাইফয়েড হ'য়েছিল, তারপর থেকে শরীর আর বাগেনি। জোরে হাস্তে গিয়ে দম বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম। শেষকালে খক্ খক্ ক'রে কাসতে কাসতে একথোকা হল্দে সর্দি উঠে এলো। চিকু হাঁপাচ্ছে। আর ঘাম্ছে।

এই দেখ্, হালটা কেমন চ্যাপ্টা কুলোপারা। শালার কানটা মলে দিলেই এই বাবুরামকে এমন বাঁই ক'রে ঘুরিয়ে দেবে না! সোতের

সাধ্যি নেই মহড়া লেয়। ব'লেই হালের পাখনাটায় একটা চুমো খায় চিকু।

—এখেনে দাঁড়িয়ে বক্ বক্ করবে! আমার বাপু ঘুম আসছে।

—আ ম'লো! মেয়ে বলিহারি যাই! এখেনে কি চৌপ্পরাত ঘুমোতে এইচিস্ নাকি? ঘুমোবার অ্যানেক সময় পাবি।

ব'লেই তড়াক ক'রে নৌকোতে উঠে পড়ে চিকু।

—দেখেচিস্ শালার লগি! তেল মাখিয়ে বুঁদ ক'রে রেখেছি। ধনুক হ'য়ে যাবে তবু মচ্‌কাবে না। শালা বানের সময় যেন ডাক ছেড়ে কথা কয়। আয় না উঠে···আয় না···হাঁদা গঙ্গারামের মত কি দেখছিস্?

—না বাপু, আমার ঘুম আসছে। দাঁড়াতে পারছি না।

নয়না বিরক্ত হ'য়ে চ'লে যায়। চিকু ডাকে।

—নয়না, শোন্ বল্‌ছি ··এ···নয়···না হো···ই···

নয়নতারা অন্ধকারে মিশে যায়। জমাট অন্ধকারের কালো বিবরে সাদা বিন্দুটি মিলিয়ে যায়। চিকু নৌকোর ওপর আড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে।

কাল পেরথম খেপেই লৌকো লাগাবো। চড়ার কাছটায় আবার আটকে যায়, শালার ফ্যাসাদ কি কম। লৌকো আটকালে যে কি বিপদ। বাবুরা চেঁচামেচি করবে। একটুও সবুর করবে না। শালা সব বাবু যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে। এ···মাঝি · মাঝি···বাস ফেল্ করবো নাকি? টেন ফেল করবো নাকি? কই ফেল্‌তো কেউ হয় না, কাউকে ফিরেও আসতে দেখি না। সবাই তো একটা না একটা টেন পায়। কাল জুটো বাঁশ কাটবে চিকু, পাল টাঙ্গাবে। তা হ'লে লৌকো আরও ছুটবে। তাকে খাটতে হবে কম, লগি ফেলে দিয়ে গ্যাঁটসে বসে থাকতে পারবে। পেলাকে সে নেবে না। শালা হারামির হাল। ব'সে ব'সে শুধু তামুক টানবে, আর বাবুদের কাছে পয়সা আদায়ের ফিকির খুঁজবে। তার চেয়ে আবু অনেক ভালো। গায়ের জোর আছে, ফাঁকিও দেয় না। সোতের মুখে এমন লগি গাঁথবে যে লৌকো মুখ গুঁজে থ' হ'য়ে থাক্‌বে। শালার ঘুন্নির কম দিয়ে গাঁজলা বেরোবে। এত জোর।

চিকু সেদিন সকালে এক খেয়া প্যাসেঞ্জার পলেমপুর থেকে সদরঘাট নিয়ে গেছে, আর ফিরে এসেছে! তার পরেই নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল চিকু। দৌড়ে এসে ডমরুকে মারলো ঠাস্ ক'রে এক চড়।

—শালা হারামির বাচ্ছা! আমার লগি লিয়েছিস্ কেনে?

সঙ্গে সঙ্গে ডমরু ছিকুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ডমরু ভীমকায়, বণ্ডা মার্কা। পা দুটো লোহার মত। চিকুর টুঁটিটা টিপে ধরলো—শালাকে শেষ ক'রে দোবো, সাপের পা দেখেছ··· ?

হাঁ, হাঁ ক'রে উঠ্লো সবাই। ঘাটবাবু চিৎকার ক'রে উঠ্লো—ওরে ছাড়িয়ে দে···ছাড়িয়ে···দে রে · ডমরু···ও ডমরু।

দু'জনকে আলাদা ক'রে দিতেই ডমরু ফুঁসতে লাগলো। ডমরু চেঁচাচ্ছে, ছাড়ালি কেনে, শালার দফা রফা ক'রে ছাড়তুম। চিকু উঠ্তে পারে নি, বালির ওপর চিৎ হ'য়ে পড়ে আছে। সবাই চ্যাং দোলা ক'রে চিকুকে ওর কুঁড়েতে নিয়ে এল। মুখের কষ বেয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। গালের এক দিকটা ছড়ে গেছে।

চিকুর পিসি হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠ্লো। নয়না ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পিসি হাঁকলো—কি দেখ্ছিস্? রথ পরোব উঠেছে না কি? চিকু...ও চিকু। দাঁড়িয়ে কি বৌ, তেল গরম কর্। আমার কি সব্বনাশ হ'লোরে।

না। চিকু অজ্ঞান হয়নি। দমবন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। জলের ঝাপটায় আর তালপাতার হাওয়ায় চোখ মেলে তাকালো। নয়না সারা রাত তেল মালিশ করলো। রাতে নয়না টিপ্পনী কাটলো—খ্যামতা নেই তো মারামারি করতে যাও কেনে? এক কড়া মুরোদ নেই তালপাতার সেপাই কোথাকার...

চিকু ঘোলা চোখে ঘড় ঘড় ক'রে আওয়াজ করলো—নয়না—

—আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

—বাজে বকবিনি, মেরে খাল খিঁচে দোব···শালীর তেল হ'য়েচে লয়?

—ওঃ কি আমার সোয়ামীরে! পরের কাছে গোড়ালি খেয়ে বোয়ের কাছে খবরদারী! অমন ঢের দেখেছি।

—তুই চুপ কর নয়না। চিকু খেপে উঠ্‌লো—শালীর বোয়ের নিকুচি ক'রেছে...নিকুচি ক'রেছে...দুত্তোর...ব'লে তেলের বাটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। নয়না বাইরের দাওয়ায় ব'সে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ ক'রে খানিক কাঁদলো। পরদিন সকালেই ঘাটবাবুর খোঁচানিতে ডমরু এসেছিলো।

বাইরে থেকে কয়েকটা ডেকেছিলো—চিকু, চিকু...

পিসি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় ক'রেছিল—কেনে...? কেনে ? কাল ছেলেটাকে মারতে মারতে পায়রা লুটিয়ে ছেড়ে দিয়েচিস্‌, আজ আবার সোহাগ দেখাতে এয়েছিস্‌? অসাধ্যে ড্যাগরা, খালভরা... মুখপোড়া...আবাগীর ব্যাটা...

ডমরু হাত জোর ক'রে বলে—মাপ্‌ চাইতে এয়েচি পিসি ; আজ চিকু আমার টুঁটি টীপে শোধ নিক। আমি রা-কাড়বোনি।

পিসি কিন্তু তারস্বরে চিৎকার ক'রে চলেছে—কেনে? চিকু কি আমার খুনে? না দস্যি ; কার গায়ে সে হাত দিয়ে বেড়াচ্ছে রে খালভরা ?

অজস্র গাল খেয়েও কিন্তু ডমরু নড়লো না। উঠোনে দাঁড়িয়ে পা ঘস্‌তে লাগলো। ঘরের ভিতর থেকে একজন ঘোমটাওয়ালী এসে দাওয়ায় একটা আসন পেতে দিলে বসবার। ডমরু বুঝলো, এ চিকুর নতুন বৌ।

—কই? কোনখানে র'য়েছে চিকু? ডমরু পিসিকে ছেড়ে নতুন বৌকে কাকুতি করলো। ঘোমটা ফাঁক ক'রে নয়না ইশারা ক'রে দিলে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কালো চোখ দুটো দেখ্‌তে পেল ডমরু। ওর বুকটা দুলে উঠলো।

—কিছু মনে লিস নি ভাই! আমারও রাগ চেপেছিল, থাকতে পারিনি। মাথায় হাত বুলোতে লাগলো ডমরু। চিকু কিন্তু একটা কথাও বললো না। ঘাড়টা একপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলো।

—আমায় মাপ কর্‌ চিকু, ঘাটবাবু যা বকেছে না, শালার আসতে পথ পাইনি। ব'লে চিকুর হাত দুটো ধরেছিলো। চিকু কিন্তু তবু কথা বলেনি। নয়না এরই মধ্যে তেল গরম ক'রে এনে দিলো।

—লাও, নিজেই পারবে, না আমাকেই মালিশ ক'রে দিতে হবে। এবার ঘোমটা একেবারে সরিয়ে দিয়েছে নয়নতারা। শ্যামলা মুখের ডৌলটি কি সুন্দর! চোখের ভ্রূ দুটি কি ভীষণ কালো। চোখের মণি দুটোও। সেখানে কার যেন ছবি পড়েছে! বিয়ের সেই পুরনো খস্‌খসে শাড়ী শরীরে যেন থাকতে চায় না। আঁচলটা খসে পড়তেই মুহূর্তের জন্য শ্যামলা শালুকটির কোরক যেন উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। লজ্জায় লাল হ'য়ে নয়না আঁচলটা আবার জড়িয়ে নিলে। কাঁচের চুড়ির ঠিনি ঠিনি বাজনা আর খস্‌খসে আওয়াজ খল্ খল্ করে হেসে উঠ্‌লো যেন। ডমরু এক দৃষ্টে দেখছিলো নয়নাকে।

—না মালিশ চাই না…মালিশ করবো নি…তুই বেরো…

—কেনে? আমাদিকে কষ্ট দিবে লয়? তাতে যে খুব শান্তি তা বুঝি নে··?

—না কাউকে কষ্ট দোব না…কিছু করতে হবে না তোদের। বাইরে থেকে পিসি হাঁকছে—বৌ…ও বৌ…

—তুই ভেতরে কি করছিলি? ডমরু ড্যাগরটা ভেতরে কি করছে?

—মালিশের তেল দিতে গেসনু। দুজনে খুনশুটি করছে··।

তেলের বাটিটা নিয়ে ডমরু এবার বললে—তা কি হয় চিকু? রাগ করলে চলে না, তা ছাড়া লতুন বৌ…কি মনে করবে? দুদিন এয়েছে বইত লয়!

—লতুন বৌ…শালির বৌয়ের নিকুচি ক'রেছে। মনে মনে বললো চিকু।

সেরে উঠ্‌তে বেশ কয়েকদিন লেগেছিলো চিকুর।

পিসি চ'লে গেছে। চিকুর বিয়ে দিতেই এসেছিলো। পিসি ছাড়া চিকুর তিন কুলে কেউ নেই। পিসিই ঘটকালি ক'রে রেলপারের নয়নতারাকে পছন্দ ক'রেছে। নয়নতারার বাপ রেলের হেড কুলি। প্রথম রাজি হয়নি; জাতে বাউরী হ'লে কি হবে, চিকুর বাখারির মত চেহারা দেখে নয়নতারার বাপ বলেছিলো কোন রোগটোগ আছে না কি? ওর সাথে নয়নার শাদি হবেনি…

পিসি দিলেশা গেলেছে—না…তার দায় আমার…

তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাঁ করেছে নয়নতারার বাপ, তবে তিন কুড়ি টাকা নিয়ে।

প্রথম দিন কাজে যেতেই ঘাটবাবু বলেছিলো চিকু, তোর লগি ও লৌকো আগে দেখে নে বাপু। আর যেন মারপিট করিস্ নি।

আবু ডেকে নিয়েছিলো—চিকু, লৌকো-লগি ঠিক আছে। আয় চলে আয়। গুরু…গুরু…

ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলো চিকু—চোখের মাথা খেয়েছিস্ আবু, কিছু দেখতে পাস্ না না কি? লৌকোর কি দশা হয়েছে!

হালের কাছে আসতেই চোখ জলে ভরে এলো চিকুর। হাত বুলোতে লাগলো। সিঁদুরটা উঠে গেছে, তেলও মাখায়নি কেউ। বুকটা টন্ টন্ করে উঠ্লো। মনে মনে বল্লো—কি করবো বল্, পড়েছিনু, কাল তোকে তেল-সিঁদুর মাখাবো। রাজরাণী সাজাবো। আজ এই সাজেই চল…

এদিকে নৌকোর ওপর এক নৌকো প্যাসেঞ্জার। ডাকাডাকি করছে।

—মাথা খারাপ না কি…এ…মাঝি নৌকো ছাড়বি কখন? ট্রেন ফেল করবো, যে। আরে বাবা! সব যে চুপ্চাপ্ দাঁড়িয়ে।

চিকু নৌকোর ওপর এসে হাল ধরলো। আবু লগি ঠেলতে লাগলো। সেদিন চিকু দুপুরবেলায় খেতে এলো না। কারও সঙ্গে একটি কথা বললো না। আবু দু-একবার খেতে বলেছে, কিন্তু চিকু সাড়া দেয় নি দেখে চুপ করে গেছে। খানিকটা ভয়ে।

সন্ধ্যেবেলায় কুঁড়েয় ফিরেই চিকু হাঁকলো নয়না…নয়না…

নয়নতারা বাইরেই লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসেছিলো। সাড়া দিলে না। নিঃশব্দে এক ঘটি জল এনে বললে—হাত পা ধোও…

—ওসব ঠ্যাটামো রাখ, একটু তেল আর সিন্দুর দে দেখি।

চিকুর স্বরে এখনও ঝাঁঝ। এবার নয়নতারা ঝেঁঝে উঠ্লো—সব দিচ্ছি, আগে হাত-পা ধোও, মুখে কিছু দাও। তারপর…তারপর

...তুমি সারাদিন, সারা রাত লদীতে লোকো নিয়ে পড়ে থাকো গে। আমি কিচ্ছু বলতে যাবোনি। কিছু কইতে যাবোনি।

বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো নয়নতারা। চিকুর মনটা গলে গেল। সত্যিই তো! নয়নতারা যে তার কনে বৌ! কাল ফুলশয্যে গেছে। অন্য মানুষ হলে বৌ লিয়ে পড়ে থাকতো। পনেরো দিন ঘাটের ছুটি লিতো। আর সে? তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো। তাকে কেউ তো বলেনি; তার মা থাকলে কি আর সে এই বিয়ের কনে ফেলে দিন রাত লদীতে কাটাতে পারতো!

চিকু লণ্ঠনটা নিয়ে নয়নার মুখটা তুলে ধরে।

কালো মুখে কপালে বড়ো সিঁদুরের টিপ। চোখের কালো তারা-গুলো শিশিরে ধোয়া দুর্বার মতো তির তির করে কাঁপছে। গালের দুপাশে জলের ধারা আবেগের নির্যাসে যেন একরত্তি ভালবাসার জন্যে ইতিউতি চলেছে। একবার মাত্র চিকুর দিকে তাকালো নয়নতারা। চিকু যেন ওর চোখের গোল আয়না দুটিতে নিজেকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করলো। লণ্ঠনের অল্প আলোতে চোখের জল থেকে মুক্তোর জ্যোতি ঠিক্‌রে বেরুতে লাগলো। চিকু ডাকলো—

—নয়না...

—না ছাড়ো। এখন দুটি মুখে দাও। আমাকে কষ্ট দিলে নিজেও কষ্ট পাবে। সে খেয়াল আছে?

নয়নতারা আসন পেতে দিলো। জল দিলো। একটা শাল-পাতায় কিছু ফল কুচো দিলো—এগুলোই মুখে দাও, সময়ে কিছু খাওনি। একটু বাদেই ভাত খাবে। ভাত হ'য়ে এয়েচে।

চিকু চেঁচিয়ে উঠ্‌লো।—নয়না, এ ফল কোথায় পেলি?

— কেন ডমরুর বুন দিয়ে গেছে।

—কে, এলোকেশী

— হ্যাঁ।

—এ আমি খাবোনি। তুলে রাখ।

—কেনে? আর তুমি যখন বিছানায় তখন যে রোজ ডমরু পাঠিয়ে দিত। মুখে তুলতে কষ্ট হয়নি, আর আজই...

—বোজ পাঠিয়ে দিতো !

—হ্যাঁ। ঘাটবাবু তো দিতে বলেছিলো। তাই দিত। কোন কোনদিন সে নিজে এসেও দিয়ে গেছে।

—ও শালার জিনিষ মুখে দোবনি ? শালা হারামির জিনিষে… থু…থু…বলেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে চিকু। নয়নতারা চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

—কোথা যাও, শোন শোন…ছুটি বাসি ভাত আছে তাই মুখে দাও। আমার মাথার দিব্যি…

—তুত্তোর ভাতের নিকুচি ক'রেচে, তুই খুব গাবকুটো ক'রে খা। ব'লেই ঝড়ের মত বেরিয়ে গিয়ে নৌকোর ওপর শুয়ে প'ড়েছিলো চিকু। ঘুমিয়েই গিয়েছিল বোধ হয়। একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখ্‌লো লণ্ঠন হাতে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। ঘুম জড়ানো চোখে কিছু বুঝতে পারলো না চিকু। নয়না ! এক হাতে তেল, আর সিন্দুর ; অন্য হাতে লণ্ঠন। বললো—নাও তেল-সিন্দুর এনেছি…কোথায় মাখাতে হবে বলো। চিকুর আনন্দে বুকটা নেচে উঠ্‌লো। সে যেন লৌকোয় চড়ে দোল খাচ্ছে। তার রক্ত, মাংস, পেশী, জীবকোষ, শিরা, উপশিরা সব যেন একটা ঐকতানে মেতে উঠেছে। চিকু এক লাফে নৌকো থেকে নেমে নয়নাকে ছুহাতে তুলে ধরলো—

—নয়না…নয়না তুই এত ভালো…এত ভালো…

—এই ..পড়ে যাবো, ছাড়ো ছাড়ো বল্‌ছি।

নয়নাকে নামিয়ে দিল চিকু। হাঁপাচ্ছে। চিকুর গায়ে খুব একটা শক্তি নেই। হো…হো…ক'রে হাসতে গিয়ে কাসতে লাগলো চিকু। নয়না লণ্ঠনটা রেখে তেল ও সিন্দুরটা হালের কাছে মাখাতে লাগলো। চিকু বালির উপর ব'সে পড়ে ফরমাস করছে—হ্যাঁ…ঐখানটায় ঐখান-টায় ভালো ক'রে তেল…আর একটু সিঁতুর…আর একটু ওপর দিয়ে… হ্যাঁ…হ্যাঁ, এ্যা এ্যাই…ঠিক হ'য়েছে। দেখি দেখি…নয়না, আমাকে একটুন তেল আর সিঁতুর দেতো।

তেলে সিঁতুর গুলে নয়নার কপালে একটা বড়ো ক'রে টিপ দিলো

চিকু। নয়না লজ্জায় লাল হ'য়ে বললো—এই…কি হচ্ছে…? চিকুর কোন খেয়াল নেই। সে নয়নাকে তুলে হালের কাছে বসলো। একবার নয়নাকে আর পরের বার নৌকোটাকে তু চোখ ভ'রে দেখতে লাগলো। নয়না অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো—এ…ই… কি…হচ্ছে? এবার ঘরে চলো …তোমার তো কাজ হ'লো?

চিকু কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল নয়নতারার কাছে। তার চোখে-মুখে কি যেন খুঁজ্‌ছে চিকু। অবশেষে নয়নাকে জড়িয়ে ধ'রে এক-সঙ্গে অজস্র চুমো খেতে লাগলো নয়নতারার; আর তার পরে চুমো খেল নৌকোটারও। পালাক্রমে। যেন তার তুজন প্রেয়সী, তুজনেই ভাল-বাসার কাঙাল।

নয়নতারাই ছাড়িয়ে নিলো—চলো আজ এখেনে থাকতে নেই… কুঁড়েয় চলো…

নয়নতারার আঁচলটা টেনে ধরলো চিকু। আঁচলটা খুলে যেতেই নয়না বললো—কি…হচ্ছে…কেউ দেখে ফেলবে যে…

—এত রাতে কে আছে দেখবার। শালা আমার বৌকে নিয়ে যা খুশি করবো কার কি বলার আছে শুনি?

নয়নতারার আঁচল ধ'রে এক হ্যাঁচকায় চিকু ওকে বুকের ওপর এনে ফেললো। নয়নতারা আর আপত্তি করেনি। চিকুকে সে মাতিয়ে তুলেছে। নয়নতারাকে বুকে চেপে ধ'রে চিকু বললো,—নয়না…নয়না…

—উঁ…। নয়নতারার উপোসী রিপুটা যেন খাদ্য পেয়েছে। আকণ্ঠ লেহন করছে চিকুর দেহটা।

—তুই তো লেখাপড়া জানিস? রেল ইস্কুলে পড়েছিস?

—হ্যাঁ, কেনে?

—তোর নামটা ঐ নৌকোর গায়ে সিঁতুর দিয়ে লিখে দিবি। চিকু যেন ডুবে যাচ্ছে। নয়নার উষ্ণ বুকের খাঁজে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে।

—ধে-ৎ। লোকে কি বলবে?

—কোন শালা কি বলবে? আর তোর নাম নয়না কে জানে?

অবশেষে নয়নতারা তার নামটা সিঁতুর দিয়ে নৌকোর গায়ে এঁকে দিলো—"নয়না"—।

চিকু একপ্রস্থ জোরে হেসেছিল। আমার লৌকো, আমার নয়না। ব'লেই আবার নয়নাকে দু'হাতে তুলতে যেয়ে বালি ধসে দু'জনেই বালিয়াড়িতে আছাড় খেলো। নয়নার চুলের ঝুঁটি খুলে বালিতে ছড়িয়ে পড়লো। চিকুরও মুখটা একটা বালির গর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। দেহে মাখামাখি থেকে বালিতে মাখামাখি। একচোট দুজনে হাসলো।

জ্যৈষ্ঠের দামোদর। কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে তাই চাঁদ নেই। নীল মেঘের ওপর কালো মেঘ জমেছিল। সেটা ঘনীভূত হচ্ছে। সোঁ সোঁ ক'রে বাতাস বইছে। বৃষ্টি আসতে পারে। দূরে একটা শিয়ালের ডাক শোনা গেল। নৌকোর তলা দিয়ে চুমকি বসানো লম্বা ফিতেটা যেন কাঁপছে। সমস্ত নদীর বুক জুড়ে যেন একটা মায়াজাল তৈরী করা আছে। চিকু সেই জালে আবদ্ধ। নয়নতারা তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু সেও আবদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে যেন।

বৃষ্টি নামতেই ঠেলা দেয় নয়নতারা।—চলো…ঘরে চলো · জল নামলো ··শুনছো···ওগো· ·

চিকু পাশ ফিরে বালির উপরেই নয়নাকে জড়িয়ে শুয়ে রইলো। নয়না আজ পরিতৃপ্তির ছোঁয়ায় আটখানা। উঠ্‌তে চায় না! কিন্তু জোরে বৃষ্টি নাম্‌লো। এবার নয়নতারা জোরে ধাক্কা দিয়ে চিকুকে ঠেলে তুললো। দুজনে প্রায় ভিজে জবজবে হ'য়ে ছুটতে ছুটতে কুঁড়েতে এলো। চিকু এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল। নয়নতারা নদীর জলে পা ধুয়ে একটু বাদে কুঁড়ের কাছে আসতেই মনে হ'লো কে যেন জানলার কাছ থেকে দৌড়ে চলে গেল। হ্যাঁ পিছনটা দেখা যাচ্ছে। বেঁটে চেহারা, ঝাঁকড়া চুল। বাঁকটা ফিরতেই মুখটা দেখতে পেলো নয়নতারা। ঘর থেকে তখন চিকু হাঁকছে।—নয়না…নয়না…কাপড় কই? নয়নতারা দৌড়ে ঘরে ঢুকলো। আরও জোরে বৃষ্টি নাম্‌লো। সারা রাত বৃষ্টি হ'লো। সকালেও।

চিকু উঠ্‌তে যাবে নয়নতারা জড়িয়ে ধরলো।

—আজ আর ঘাটে নেই বা গেলে! একদিন ঘরে থাকো না!

—ওঃ আহ্লাদে আটখানা। মামার বাড়ীর আব্দার নাকি?

ঘাটে যাবো না। ছাড়্...ছাড়্...। জোর ক'রে নয়নতারার বাহুবন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠে পড়ে চিকু।

বেশ বেলা পর্যন্ত শুয়ে রইলো নয়নতারা। আজ তার বিয়ের তিন দিন। কিন্তু সে একা, বড় অসহায়, বড় নিঃসঙ্গ। তার চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। একটি মেয়ের চেঁচামেচিতে ঘর থেকে দাওয়ায় এসে বসলো নয়নতারা। এলোকেশী, ডমরুর বোন। সেইই আগে বললো—কি হ'লো বৌদি, শরীর খারাপ না কি?

—হ্যাঁ, দেহটা ভালো নেই। তাই শুয়েছিনু।

—চিকুদা নিশ্চয়ই চ'লে গেছে?

কোন উত্তর না দিয়ে নয়নতারা মুখ নীচু করলো।

—জানো বৌদি! তোমার বরাতে কষ্ট আছে অ্যানেক। ও তো ঐ রকম। মোটেই ঘরে থাকে না। দিনরাত নদীতে পড়ে থাকে। ওর পিসি তো ঘটকালি ক'রে তোমার সঙ্গে বিয়েটা দেওয়ালে, যদি—

ফিক্ ক'রে হেসে এলোকেশী ব'লে—যদি তুমি তাকে ঘরে অন্ততঃ রাতটা আটকে রাখতে পারো।

নয়নতারার সামনে সব ঝাপ্‌সা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে চারদিকে জমাট কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সামনে এলোকেশীও যেন এমনি একটা কুয়াশার কুণ্ডলী। নাচতে নাচতে কি ইঙ্গিত করছে, কিছু বুঝতে পারছে না। মনে হ'লো, সে নিজেও ঘুরছে।

—বৌদি...বৌদি...কি হ'লো?

নয়নতারা ঘরের দাওয়ায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সেছিলো। হঠাৎ ঢ'লে পড়তেই ধ'রে ফেল্‌লো। আস্তে আস্তে শুইয়ে দিয়ে ডাকলো—বৌদি...বৌদি...কি হ'লো...এমন হ'লো কেন? ও মা! কি করবো! মুচ্ছো গেল না কি?

কাছেই ঘটিতে জল ছিলো মুখে চোখে ঝাপটা দিলো। কিন্তু নয়না নির্বিকার। এলোকেশী ছুটলো ঘাটের দিকে। চিকু তখন এক নৌকো প্যাসেঞ্জার নিয়ে মাঝ নদীতে। এলোকেশীর চীৎকার—চিকুদা,...চিকুদা...বৌদি অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। কিন্তু চিকু সম্ভবতঃ শুনতে পেলো না। পাশেই ছিল ডমরু। এগিয়ে গেল—কি হ'য়েছে?

—চিকুদার বৌ অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

ডমরু এলোকেশীকে বল্‌লে, তুই চ, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিবি। আমি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডমরু যখন ডাক্তার নিয়ে এলো, তখন নয়নতারা উঠে ব'সেছে। মাথায় কাপড় নেই, চুলগুলো ভিজে পিঠে, কাঁধে বুকের ওপর লেপ্টানো—কিছুটা মাটিতে লুটোচ্ছে। জলের ঝাপটায় মুখ, ঘাড় ও বুকের কাপড়, ব্লাউজ ভিজে দেহের সঙ্গে চিটে আছে। উদাস চাহনি পাশেই ব'সে এলোকেশী।

ডাক্তার বললে, দুর্বলতার জন্যেই হ'য়েছে। একটু গরম দুধ এখুনি খাওয়াতে হবে। আর এই ওষুধগুলো বর্ধমান থেকে আনিয়ে নাও।

এলোকেশী নিজেদের ঘর থেকে দুধ এনে গরম করতে বসলো। ডমরু বর্ধমানে ওষুধ আনিতে গেলো।

দুপুরে যখন ডমরু ওষুধ নিয়ে এলো, তখন প্রথম কথা বললো নয়নতারা—তোমরা আমার জন্যে কেন কষ্ট করছো?

ডমরু ধমক দিলো—সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে নি। তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকো। এলো বৌএর গা-টা গরম জলে মুছিয়ে দে। আমি চললুম।

সারাদিন এলোকেশী ছিলো। খুব করলো। গরম জলে গা মোছালো, চুল ঝেড়ে দিলো, কাপড় কেচে দিলো, গরম দুধ খাওয়ালো এবং সন্ধ্যে পর্যন্ত ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে বাড়ী গেল।

যাবার সময় হাতটা চেপে ধরলো নয়নতারা—ভাই, আমার জন্যে কেনো এত করচো...আমি তোমাদের কে?

—কাছে ছিলাম, আমি না করলে আর কে করবে বৌদি?

সন্ধ্যে হ'লো। নয়নতারা ঠায় ব'সে রইলো। আলো জ্বাল্‌লো না। পাতলা অন্ধকার ঘর ছেড়ে দাওয়া, দাওয়া ছেড়ে উঠোনময় ছড়িয়ে পড়লো। মানুষটা যে সেই সকালে বেরিয়েছে এখনও ফিরলো না। কোথায় থাকে! কি করে! সেখানে তার কি কি আকর্ষণ! কে তাকে বেঁধে রাখে? তার কাছে কি নয়নতারা কিছুই নয়! সে তো

সেদিন দেখে এসেছে। একটা নৌকো কাঠের নির্জীব ঐ পদার্থটার কি মায়া, কি যাদু আছে? লোকটা চায় কি! যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম কি তার মধ্যে নেই? ঘরে যৌবনবতী স্ত্রী, সদ্য বিবাহিতা। তার কি কোন আকর্ষণ নেই? এসব নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা হয়ত নয়নার নেই। কিন্তু তার মানসিকতার একটা স্কেচ তুললে এইরকমই দাঁড়ায়। হু-হু ক'রে কেঁদে ফেল্‌লো নয়নতারা। বাইরে কার গলা শোনা গেল। হুট্ পাট ক'রে ঢুকলো একজন লোক। উঠোনে এসেই লোকটা চীৎকার সুরু করলো—নয়না, নয়না লণ্ঠন জ্বালিস্‌নি কেনে?

নয়নতারা বুঝলো লোকটা চিকু; যার ঘর করতে এসেছে সে। ঘর পেয়েছে, কিন্তু ওই পর্যন্ত! ওকে পাবে না সে। কোন জবাব দিতে ইচ্ছে হ'লো না।

—আ মলো সাড়া দিস্‌নি কেনে? কানের মাথা খেয়েছিস্ না কি?

এবার নয়নতারা উঠ্‌লো। লণ্ঠনটা জ্বাল্‌লো।—শোন্। আমার নৌকো সারাই হচ্ছে। শালার কি বিপদ! সারা দিন জল ছিঁচেছি। তলা ফুটো হ'য়ে গেছে কখন জানতে পারিনি। তুই খেয়েই শুয়ে পড়িস্। আমি ওখানে ঘাটের মেসে খেয়ে লোবো। বুঝলি?

রান্নাশালার চালায় কতকগুলো কাঠ তুলে রেখেছিলো। চিকু সেগুলো দুম্ দাম ক'রে পাড়লো আর বোঝা বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। তার যেন এতটুকু ফুরসুৎ নেই। ঘাটে গিয়েই মিস্ত্রির পিছু নিল চিকু।—ওসব চালাকি শুনবো নি। কাল আমার নৌকো রেডি করতে হবেই—বাবুরা ব'লে দিয়েছে। আবু কোথায় গেলা? আবু... আবু এই...এই মিস্ত্রি আগে কাঠের ফালিগুলো তৈরী ক'রে লাও। এই...দেখ ভালো কাঠ সরিয়ে রেখেছিলম। হুঁ...উঁ.. বাবা! ওসব ফাঁকিবাজি চলবে নি · চিকু সব জানে।

নৌকো সারাই এর দুজন মিস্ত্রি ঠকা-ঠক্ কাজ করছে। চিকু একটা হ্যাজাক জ্বেলে দিয়েছে। কাঠ কারাই হচ্ছে, ফালি তৈরী হবে। চিকু চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—লোহার সেলাইটা কিন্তু ভালো হওয়া চাই, ভেতর দিকে

মুড়ে কাঠের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হবে। যেন এমুখ ওমুখ কামড়ে ধরে। আব্...আবু...এ আবু...

—শালা পেটুক ; হারামির হাল, খাবার জন্যে মলো।

ছোটবাবু এলো—চিকু...

বাবু ..

—তা হ'লে তুই দেখে শুনে তোর নৌকো ঠিক ক'রে নিস্।

হ্যাঁ বাবু, সে আর বলতে দু সিজিন কাটিয়ে দেবো—একটু তালি লাগবেনি। নয়নতারা একস্পেস্ বলেই হাসতে লাগলো। ছোটবাবুও।

ছোটবাবু একটা সিগারেট ধরালো। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, সৌখীন মানুষ ছোটবাবু। চিকুকে কাছে ডাক্‌লো—হ্যাঁরে তোর ঘরে নতুন বৌ র'য়েছে, ঘরে যাবি নি ?

মুচকি মুচকি হাসছে ছোটবাবু।

চিকু ঘাড় চুলকে বল্‌লে—তা হলে এখেনে যে মিস্ত্রিরা বেগার শোধা কাজ করবে বাবু। আমার কি ঘুমানো চলে ? বৌকে ঘুমুতে ব'লে এয়েচি।

—হ্যাঁ, বৌ তো আর কালই পালাচ্ছে না, কি বলিস্ চিকু ? হো ...হো...ক'রে ছোটবাবু হেসে উঠ্‌লো। চিকু জোড়হাতে বল্‌লো—জে আজ্ঞে...।

সাত সতেরো ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল নয়নতারা। ধুলোর ওপর দাওয়াতেই। পাশেই লণ্ঠনটা দপ দপ ক'রে জ্বলছিলো। নয়নতারা একটা স্বপ্ন দেখছিলো, যেন একটা কালো দড়ি তার গলায় জড়ানো র'য়েছে। সেটা আবার পর মুহূর্ত্তে সাপ হ'য়ে হিল্ হিল্ ক'রে উঠ্‌লো। একটা চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো নয়নতারা। কিন্তু মনে হচ্ছে, তার দম বন্ধ হ'য়ে গেছে ; সে আর চিৎকার করতে পারছে না। সারা শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো।

—কে ? দরজায় কে দাঁড়িয়ে ?

কথা কইতে গিয়েও কথা বলতে পারলো না। প্রশ্নটা যেন ভিতর

থেকে জড়িয়ে অস্পষ্ট একটা বীভৎস আওয়াজ হ'য়ে গেল। নয়না কানে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করলো—উঃ…

আবার ছায়া মূর্তিটা দাওয়ার কাছে সরে এলো। কথা বললো—

—কি হ'লো ?

—কে তুমি ?

—আমি ! চিনতে পারছ না ?

—না। উদাস ভাবে উত্তর দিলো নয়নতারা। চোখের ওপর এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে নয়নতারার। তার মধ্যে দিয়ে দেখছিলো লোকটাকে। মাথ মুখ, সমস্ত দেহ যেন কতকগুলো আঁকা-বাঁকা রেখা দিয়ে ভাগ করা যেন ছুরি চালিয়ে বিকৃত করা হ'য়েছে। ফলার ধারালো আগায় চামড়া কেটে লাল রক্তের রেখা হ'য়েছিল। রক্ত শুকিয়ে কালো হ'য়ে গেছে। চোখের সামনে থেকে চুলগুলো সরাতে গিয়েই টলে পড়েছিলো নয়নতারা। লোকটা দুহাতে ধ'রে ফেললো নয়নতারাকে।—কি হ'লো প'ড়ে যাচ্ছো কেনে ?

এবার চুলগুলো সরাতেই নয়নতারা দেখতে পেলো, যার বুকে মাথা রেখেছে সে যেন চেনা চেনা ··! কোথায় দেখেছে…। চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করলো। কোথায় আছে সে ? কার কাছে ? তার বাবা…মা…পিসি…রেলপার…

লোকটা দুহাতে নয়নতারাকে কোলে তুলে নিলো। ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় শুইয়ে দিলো। লণ্ঠনটা নিয়ে এসে নয়নতারার মুখের কাছে রাখলো। ঘটি থেকে একটু জল নিয়ে নয়নতারার চোখে মুখে ছিটিয়ে হাত বুলিয়ে মুছিয়ে দিলো। ঠাণ্ডা জলের ভিতর দিয়ে আলোর অস্পষ্ট আভায় এবার চোখ খুলে তাকায় নয়নতারা।

—ডমরু ? হ্যাঁ, ঐ তো বেঁটে কালো থামের মতো, ঝাঁকড়া চুল—ডমরু ! বিদ্যুতের মতো উঠে বসে নয়নতারা। পাগলিনীর মত চিৎকার করলো—

—তুমি ? তুমি, এখেনে, আমার ঘরে কেনে ? বেরোও, দূর হও। নইলে শেষ ক'রে দোব—

রাগে কাঁপতে কাঁপতে নয়নতারা হাতের কাছে জলের ঘটিটা ছুঁড়ে

দিল ডমরুর দিকে। পায়ের গোড়ালিতে ঘটিটা পড়েছে। নেংচাতে নেংচাতে পালিয়ে গেল ডমরু। নয়নতারা ভাবতে পারছে না। চিকু কোথায়? যত রাগ তার ওপর গিয়ে পড়লো। রাগে, অভিমানে, দুঃখে হু হু ক'রে কাঁদলো নয়নতারা।

শেষ রাতে এসেছিলো চিকু। ঢুকেই হাঁক, ডাক ক'রেছিলো—

—নয়না, নয়না…

নয়নতারা অবসন্ন দেহে চুপচাপ প'ড়ে রইলো। চুপচাপ - চোখ বুজে। আর ঘুম আসেনি। চিকু ফের চেঁচামেচি করলো—নয়না…এ …নয়না…আলাটা লিবিয়ে দিতে পারিস্ নি বুঝি? দর্ দর্ ক'রে জ্বল্‌ছে ··এ— লবাবের বেটি…

কোন সাড়া দেয়নি নয়নতারা। ঠোঁট কামড়ে পড়ে রইলো। রাগে, দুঃখে তার ভেতরটা ক্রমশ হাপর টানার মত ফুল্‌ছে। চুপ ক'রে পড়ে রইলো। চিকু আবার বল্‌লো - কালঘুম ঘুমুচ্ছিস্? ছাঁচতলায় জলের ঘটিটা পড়ে কেনে? দাওয়াতে কে এত জল ঢাললে?

চিকু অবাক হ'লো! লণ্ঠনটা নিয়ে নয়নতারার কাছে এলো।

—এঃ একেবারে ধূলোর ওপর শুয়েচিস্—এ…নয়না · নয়না। নয়নাকে জোরে ঠেলতে লাগলো চিকু। লণ্ঠনটায় তেল ছিল না। বার কতক দপ্ দপ্ ক'রে নিভে গেল। ভোরের পাতলা অন্ধকারে চিকুর কুঁড়েটা অবগুণ্ঠন টানলো। আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। কতকগুলো নক্ষত্র একটা স্তূপ মেঘের তলায় ঢাকা পড়েছে। বাইরে সোঁ …সোঁ বাতাস দিচ্ছে।

চিকু নয়নতারার মাথায় হাত বুলোতে যেয়ে চম্‌কে উঠ্‌লো! একি! মাথার চুলগুলো এত ভিজে কেনে? সন্ধ্যেবেলায় ধোয়া চুল এখনো শুকোয়নি হয়তো। মুখ, গলা, বুক সবই তো ভিজে। বুকের খানিকটা কাপড়ও ভিজে গেছে। অন্ধকারে নয়নতারাকে দেখতে চেষ্টা করলো চিকু। বিয়ে হ'য়ে থেকে সে তো কোনদিন ভালো ক'রে তাকায়নি। আঃ লণ্ঠনটাও ছাই নিভে গেল গেল। বুকের কাছে সরে এলো চিকু। হ্যাঁ, এবার মুখটা দেখা যাচ্ছে। চোখের ভ্রূ দুটো এতো

কালো যে অন্ধকারেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নাক, মুখ দেখতে কেমন? গায়ের রংটা কালো। কিচ্ছু বুঝতে পারছে না চিকু। সকাল হ'লে ভালো ক'রে একবার দেখবে। সবাই বল্‌ছে, তার লতুন বৌ কেমন!

চিকু কিন্তু এই মুহূর্তে কি যেন আবিষ্কার করলো। নয়নতারার ভ্রূ ছুটো আঙুল দিয়ে আঁকলো, এতেও জল লেগে র'য়েছে। চিকুর যেন মনে হ'লো ভ্রূ ছুটা—ছুটো ছোট্ট নৌকো। উত্তেজিত হ'য়ে চিকু নয়নাকে জড়িয়ে ধ'রে ভ্রূ ছুটোতে চুমু খেলো।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো নয়নতারা—ছাড়ো...আমার দেহ খারাপ···

—দেহ খারাপ তো কি হুইচে? উ সব কিছু লয়, কাল সেরে যাবে।

নয়নতারার হাত ছুটো বুকের কাছে চেপে ধ'রে হিঃ হিঃ ক'রে হাসতে হাসতে চিকু বলে—জানিস্ নয়না, শালার মিস্ত্রিরা কি ফাঁকি দেয়। আমায় তখুনি বঁলেছিলো লৌকোটা সারতে চৌপর দিন লাগবে। শালা আমিও ছিনে জোঁক, বাবা। সারা রাত কাজ করিয়েচি। কাল কোনরকমে খেয়া চলবে। আবার কাল রাতে লাগবো। শালার আমার কাছে·· যতো সব···চিকু অনর্গল বকছে। নয়নতারা অবাক হ'য়ে মানুষটার দিকে চেয়ে আছে। মনে হচ্ছে, তার সামনে র'য়েছে একটা পাথরের মূর্তি। মূর্তিটা নড়ছে না, কিন্তু কথা বলছে, হাসছে না, কিন্তু ঠোঁট নড়ছে। এ মূর্তি স্থির নির্জীব। কথা ভেসে আসছে দূর থেকে, নদীর ঘাট থেকে, নৌকোর দেহ থেকে। নৌকোর অন্ধকার বিবর থেকে।

চিকু বকছে—জানিস্ নয়না, আজ ছোটবাবু না, বলছে, চিকু তোর ঘরে লতুন বৌ, ঘরে যাবিনি? আমার শালা যা লজ্জা পেয়েছিলো না: ছোটবাবু এতো ফচ্‌কে, আবার মুচ্‌কি···মুচ্‌কি···কি হাসি...। ছোটবাবুরও এই লতুন বৌ এয়েচে কি না। শালার গায়ে কি বাস তেলের গন্ধ মাইরি...। আমি গেসনু তো বিয়েতে···কি সোন্দর বৌ... একবার সাদা ধব্‌ধপে গা। দেখলেই লোভ লাগে। সাতদিন ঘাটে আসেনি...বৌ লিয়ে হিল্লি···দিল্লী...কত যে ঘুরলো:

নয়নতারা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লো। এই মানুষটাকে কি বুঝতে চেষ্টা করছে নয়নতারা? নয়নতারা যেন তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে, কোথায়, কোনখানে এই মানুষটার মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে। খুব তীক্ষ্ণ চোখে নয়নতারা চিকুকে দেখতে লাগ্‌লো। সেও তো ভালো ক'রে দেখেনি চিকুকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি আছে? চোখগুলো ব'সে গেছে? অন্ধকারের মধ্যে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না। গায়ে সেই বিয়ের গেঞ্জি। পরণেও সেই মোটা পাড় পুরানো ধুতি। এখানে ওখানে কাদার ছোপ লেগেছে। পাতলা চেহারা। বুকের দুপাশে কাঁধের কাছে শির দুটো উঠে আছে। নয়নতারার নরম হাতে এখনো চিকুর হাতের বাঁধন। নয়নতারা আঙ্গুলগুলো নেড়ে চেড়ে দেখলো, শক্ত কঞ্চির মতো···দেহে কোন রস কষ নেই···। কিন্তু···তবু তবু যেন কোথায়···

নয়নতারার দৃষ্টি যেন চামড়া ভেদ ক'রে, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ভেদ ক'রে চিকুর দেহের মধ্যে যে অসংখ্য কোটি কোটি জীবকোষ র'য়েছে —যারা প্রাণশক্তির জন্য দায়ী, সেই জীবকোষগুলোর উপর সন্ধানী আলো ফেল্‌তে সুরু করলো। একটি একটি ক'রে প্রত্যেকটি জীবকোষের মধ্যে রহস্যের সন্ধান ক'রে চল্‌লো।

কিন্তু না। নয়নতারা অশিক্ষিতা। রেল স্কুলের নিম্নবৃত্তি অতিক্রম করলেও বিজ্ঞানের বিস্ময় তার জানা নেই। নয়নতারা যদি বিজ্ঞানী হ'তো তবে সন্ধানী দৃষ্টি ফেল্‌তো জীবকোষের ভিতরে যে 'জীন' আছে তার উপর। মানুষের স্বভাব, চরিত্র, মেজাজ, অভ্যাস, আচার, ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি সবই নির্ভর করে এই 'জীনের' গঠনের ওপর। আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে আজও যার গঠনরীতি বিশ্লিষ্ট হয় নি, নয়নতারার সাধ্য কি তার ধারে কাছেও ঘেঁষে?

সম্ভবতঃ নয়নতারা আর ভাবতে পারছে না। চিকুর কথায় ও এ জগতে ফিরে আসে।

—হ্যাঁ রে নয়না, কোন রেলটা সব চাইতে জোরে যায় রে?

—তুফান এক্সপ্রেস। হঠাৎ যেন নয়নতারা সহজ হ'য়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যেও সে আলো দেখতে পেলো। সেই আলোতে যেন

সবাই গা ধুয়ে নয়নতারার কাছে হাজির। আর তাইতে নয়নতারা সব কিছু স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে। সে নিজেও কি ঐ আলোতে ডুব দিয়ে এসেছে? নইলে তার গায়ে ব্যথা কই, সারা রাতের ক্লান্তি কই, অবসাদ কোথায় গেল! এই অন্ধকারটা চিকুর গায়ের রঙের সঙ্গে মিলে গেছে, কি মিষ্টিই যে লাগ্‌ছে! অন্ধকারের চোখে, মুখে, গালে, সর্বদেহে মনে মনে যেন অজস্র চুমু খেলো নয়নতারা। চিকু ওকে ফের টেনে নিয়ে এল—

—হ্যাঁ রে নয়না এক কাজ করবি?

—কি?

—চল্‌ তো, আমার লোকোটার গায়ে তুলি দিয়ে লিখে দিবি, তুফান এক্সপেস···না···না···না—"নয়নতারা এক্সপেস··"

—রং কই? তুলি কই? উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লো নয়নতারা।

—চ না। বাবুরা রেলিং-এ দোব ব'লে এনেছিল সাদা রং তুলি···

—চলো, খুব ভালো হবে।

তুজনে ছুটে নদীর গর্ভে নাম্‌লো। ভোর হতে আর দেরী নেই। শুকতারা আজ বড় বেশি উজ্জ্বল। আকাশ আজ বেশ পরিষ্কার। খুব নীচে তু-এক টুকরো ছেঁড়া মেঘ লেপ্টে আছে। বাকী আকাশ স্বচ্ছ হাসিতে দিগ্বলয় উপছে পড়ছে।

চিকু বলে, তুই চ লোকোর কাছে, আমি রং তুলি আনছি।

নয়নতারা বেশ লিখ্‌তে পারে। উচ্চ প্রাথমিক পাশ সে। চিকু লেখাপড়াই শেখে নি। নয়নতারা যখন বড় বড় ক'রে লিখে দিল, "নয়নতারা এক্সপ্রেস···" তখন চিকুর আনন্দ ধরে না। চিকু নয়নতারাকে তু'হাতে তুলে নাচতে আরম্ভ করলো। লেখাটা দেখে চিকুর আশা আর মেটে না।

এক সময় নয়নতারা ওর হাত তুটো ধ'রে কাছে টানলো।—এবার ঘরে চলো...একটু গড়িয়ে নেবে···

হো...হো...ক'রে হেসে উঠ্‌লো চিকু।—তোর মাথা খারাপ, ভোর হ'য়ে গেছে দেখতে পাস নি? হোই দেখ শুক উঠে গেছে···আর হোই দেখ পূব দিকটা ফরছা হ'য়ে গেছে।

নৌকোর দড়ি-দড়া নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো চিকু।— বল্‌লো নয়না···তুই বরং একটু শুগে যা···বুঝলি দাঁড়িয়ে থাকবিনি...যা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো নয়নতারা। আলোটা সরে যেতেই সে যেন অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগ্‌লো। আর দড়ি টানছে ঐ মানুষটা! ওটাকে একটা কালো পিশাচ ব'লে মনে হ'লো। দড়িগুলো যেন অসংখ্য সাপ। হিল্‌ হিল্‌ ক'রে ছোটাছুটি করছে। নৌকোটা একটা বিবর্ণ ধোঁয়াটে দূষিত গর্ত্ত। সেখান থেকেই কি ঐ পিশাচটা, আর সাপগুলো এসেছে? ভাবতে পারছে কই নয়নতারা!

সে অন্ধকারে রাস্তাও দেখতে পাচ্ছে না।

ঘরে ফিরে হাতড়ে হাতড়ে ওষুধের শিশি, মোড়া·· সব ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো নয়নতারা—আমার কিচ্ছু হয়নি·· আমি কাহিল নই···আমি সবল···। নয়নতারা নিঃশব্দে কাঁদলো। অবরুদ্ধ বেদনা যেন মোমের মত গলে গলে পড়লো। সকাল হ'তেই নয়নতারা যেন আবার স্বাভাবিক। মুখটা গম্ভীর জলভরা মেঘের মতো ভারী অথচ স্থির। দ্রুত পায়ে ঘরের কাজ সারলো একেবারে পাকা গিন্নীর মতোই। বেশ ক'রে তেল মাখলো। কলসী ও গামছা নিয়ে ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে চললো নদীর ঘাটে গা ধুতে। সেখানে মাঝি পাড়ার বৌ-ঝিরা আগে থেকেই আসর জমিয়েছে। হাসি-মস্করার আওয়াজ আসছে। নয়নতারাকে দেখেই এ ওর চোখ টিপ্‌লো, গা টিপ্‌লো। এদের কারোরই সঙ্গে নয়নতারার পরিচয় হয়নি। একজন বললো—এ আমাদের চিকুদার বৌ, রেলপারের নেকাপড়া জানা হুঁ···উঃ

একজন বয়স্কা বললো—ওঃ—তাই বল্‌, আমি মনে করি কে না কে? তা বেশ বাছা চান সারো···

নয়নতারার সমবয়সীরা এগিয়ে এলো— কেমন লাগচে বৌ···

—বেশ তো মন্দ কি?

—চিকু ঘরে থাকছে তো?

নয়নতারা বুঝলো, চিকু যে ঘরে থাকে না, এ কারো আজানা নেই বল্‌লো—

—কেন থাকবে না? কান টানলেই মাথা আসবে!

ব'লে এমন একটা ভঙ্গি ক'রে মুচকি হাসলো নয়নতারা, যে কেউ অবিশ্বাস করতে পারলো না তার কথা। খুশিতে যেন ডগমগ হ'য়ে জলে নামলো নয়নতারা। বল্‌লে—তোমাদের সঙ্গে চেনা জানি হয়নি…

—থাকতে থাকতেই হবে বৌ…এমন হ'বে যে তখন টেনে ছাড়ানো দায়…সবাই হো…হো ক'রে হাসতে লাগলো!

প্রৌঢ়া মহিলা বল্‌লে—তা হ্যাঁ লো, চিকু ঘরে আসচে তো?

অন্য একজন জবাব দিলো—হ্যাঁ বৌদিমণি বল্‌ছে, কান টানলেই মাথা আস্‌বে।

প্রৌঢ়া উত্তর দিলো—আমার বুনঝিকে দেবার জন্যে ওর পিসি ঝুনোঝুনি; আমিই হ'তে দিইনি। কি জানি, চিকু যা ছেলে, বিয়ের পরও যদি আদাড়ে বাদাড়ে পড়ে থাকে…। তা…বেশ বাছা…তুমি যে ওকে বাঁধতে পেরেছো…

স্নান সেরে উঠে আসবার সময় এলোকেশীর সঙ্গে দেখা। ও চান করতে যাচ্ছে। —আরে…বৌদি…একেবারে চাঙ্গা…কাল রাতে দাদা এয়েছিলো?

মুচকি হেসে নয়নতারা বলে—আসবে না…! এসেই যে মাথার গোড়ায় ব'সেছিল আর উঠ্‌তে চায়নি। আমিই তো ঠেলে পাঠিয়ে দিলুম। কাজের মানুষ ঘরে ব'সে থাকলে কি চ'লে?

—ও তাই, আজ একেবারে চাঙ্গা? ফিক্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো এলোকেশী।

এলোকেশী প্রায় তারই সমবয়সী, এখনো বিয়ে হয়নি। নয়নতারা ওর রসিকতাটা ধরতে পারলো কি না কে জানে? তেমনি চোখের ইশারায় বললে—যা ব'লেছিস্…ভাই…একেবারে চাঙ্গা…সারা রাত গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েছে…যেন মালিশ…হিঃ হিঃ ক'রে দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—হ্যাঁ, এলো, শোন্, তোর দাদাকে একবার যেতে বলিস্ তো।

—কেনে আমার দাদাকে কেনে? একজনের মন তো মজাচ্ছো…

—দূর পোড়ারমুখী, শুকনির মতো নজর অতো ছোটো কেনে ? বিয়ে হোক বুঝবি ! একজনেই খেদ মেটে না, দুজনকে চাই···

এলোকেশী কি বুঝলো কে জানে। বলে—তাই নাকি "বৌদির যে রস উথ্‌লে উঠ্‌ছে গো" বলেই হাসতে থাকে।

উনোনে হাঁড়ি চাপিয়ে ছাই পাঁশ কি ভাবছিলো। এমন সময় আস্তে আস্তে পা টিপে একেবারে পিছনে এসে দাঁড়ালো ডমরু।—বৌ··· কেন ডেকেছিলি...

পিছন ফিরে তাকালো নয়না। বললো—তোমার ওষুধের দাম কতো....

—ওষুধের দাম... ?

—হ্যাঁ...

—উ দিতে হবে নি।

—কেনে ? তুমি কি দান ধ্যান করো ? না, আমরা দান নিই ?

রেলপারের মেয়েকে কথায় পেরে ওঠা ভার। ডমরু ঘাড় নাড়লো—

—না, বৌ, ও তোমায় দিতে হবে নি। চিকু আমার বন্ধু···

—হ্যাঁ, তোমার বন্ধু, কিন্তু দরকার না পড়লে দেবে কেনে ? বলো কতো দাম··· ?

নয়নতারার মাথায় ঘোমটা নেই। চুল পিঠময় ছড়ানো। কপালে একটা বড়ো সিঁদুরের টিপ প'ড়েছে। সিঁথিতে অনেক বেশি সিন্দুর। মুখের নিটোল গড়নে কালো ভ্রূ দুটো প্রজাপতির ডানার মতো ! যেন একটা প্রজাপতি উড়ে এসে ব'সেছে। চেক কাটা নীলচে শাড়ি ছাপিয়ে খুশিতে ডগোমগো একটা আহ্লাদ ফেটে পড়তে চাইছে। ডমরু অবাক চোখে তাকিয়েছিল। বললে, দাম সত্যিই নিতে হবে ?

—হ্যাঁ।

—পাঁচ টাকা।

ঘরের ভিতর থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট এনে ডমরুর হাতে দিলো। বল্‌লে—আর তুমি এসো না ডমরু···

ডমরু। নিজের নামটা নয়নতারার মুখে শুনতে কি ভালোই যে লাগলো!

অস্ফুটস্বরে ডমরু বল্‌লো, বৌ……

—না। ও এখন রাতে ঘর আসে। তোমায় দেখতে পেলে বাড়ী মাথায় করবে…

—কে? চিকু? কে…বল্‌লে? ও তো এখনো সারা রাত ঠায় নদীতে পড়ে থাকে…এই তো কাল সারা রাত নৌকো মেরামত… এলোকেশী যে বলে…

চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো নয়নতারা: না—না—না। ও কোথায় থাকে, কি করে আমি তার বৌ, আমি জান্‌বো না, তুমি জানবে? তুমি আর এসো না, তুমি চলে যাও, দূর হ'য়ে যাও…বেরোও…

ডমরু ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। রাগে তালপাতার মত শরীরের লোমগুলো কাঁপতে থাকে নয়নার।

সেদিন দুপুরে চিকু খেতে এলো। নয়না যত্ন ক'রে খাওয়ালো। কাছে ব'সে পাখার বাতাস করলো। চিকু অবাক্‌!

—ওরে বাস্‌! এ যে ছোটবাবুর বোয়ের মত আদর সুরু করলি নয়না। আচ্ছা রেঁধেছিস্‌ তুই…বেড়ে রান্না জানিস্‌ তো?

—তবু তো তুমি ঘরে থাক্‌ছো নি। কি করলে তুমি ঘরে থাকো?

হো‥ হো…ক'রে হাসতে লাগলো চিকু।—ও মাইরি! ফাঁদ পেতেছিস বুঝি…? হাত চাট্‌তে লাগলো চিকু।—অ্যানেকদিন এমন খাওয়া খাইনি, বুঝেছিস্‌? তোর রান্না ফাস্‌কেলাস‥

—হ্যাগো…নয়নের গলায় ধরা আওয়াজ। শুনছো…?

—উঁঃ…

—দেখো তো, তুমি সেই টিপ পরিয়ে দিয়েছিলে। আমার কপালের টিপটা তোমার মতো হ'য়েছে কিনা?

হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছটফট ক'রে উঠ্‌লো চিকু: দে…দে …তাড়াতাড়ি জল দে…শালার আবার মেঘ ক'রেছে পানি এলো ব'লে। ছইগুলো সব ভিজবে। কোনরকমে মুখ ধুয়ে চিকু দৌড়লো।

টিপ্‌টাপ্‌ বৃষ্টি নামলো।

—রাতে এসো কিন্তু।

নয়নতারার গলা ভেঙ্গে যেন স্বরটা কান্নার মত ককিয়ে উঠ্‌লো। চিকু কি জবাব দিল শোনা গেল না।

শুধু দেখ্‌লো: চিকু দৌড়চ্ছে। নদীর বুকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। একটা অন্ধকার পর্দার মধ্যে চিকু ঢুকে গেল। সব অস্পষ্ট। সব ঝাপ্‌সা লাগছে। নয়নতারা চোখ মুছ্‌লো।

এদিকে ঘাটে নৌকো লাগিয়ে আবু হাঁকছে: এ…ই…যে… এই যে বাবু মশায়রা নয়নতারা এক্সপেস ছাড়্‌লো ব'লে…পিঁ… পিঁ…মুখেই বাঁশি বাজাচ্ছে। যতো প্যাসেঞ্জার ঐ নৌকাতেই উঠ্‌ছে। ছাড়বার সময় হ'য়ে গেছে। আবু এদিকে ওদিকে চিকুকে খুঁজছে: চিকু হে…ই দূরে চিকু ছুটে আসছে। ভিজে গেছে: শালার ছইগুলো সামলাতে গিয়েই…তো হারামির যদি এতটুকুন চোখ থাকে?

—এই…যে—এসে গেছি। এক লাফে চিকু নৌকোতে উঠে হাল ধরলো। আবু চিৎকার করলো: এ…ই…যে বাবুমশায়…গাড়ি সায়েব এসে গেছিন… ছাড়লো ছাড়লো এক্সপেস… নয়নতারা এক্সপেস…

নৌকো লগির ঠেলে এগিয়ে চললো।

আবুর বলিষ্ঠ দেহ, পেশীবহুল পাথরের মত চেহারা, ঝাঁকড়া চুল। কপালে বিরাট একটা আব। লগির প্যাচে ও একাই একশো। অন্য প্যাসেঞ্জার নৌকোগুলোকে পিছনে ফেলে নয়নতারা এক্সপ্রেস এগিয়ে চল্‌লো। আবু বলে: দেখছেন কি মশায়, আপনারা এক্সপেসে চেপেছেন। ওদের বাপ লাগে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

অন্য নৌকোগুলোও জোর চালাতে চেষ্টা করছে। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে তীব্র কোলাহল হৈ-চৈ দেখ্‌বো · দেখ্‌বো… কে জেতে কে হারে …কে আগে যায়?

চিকু চিৎকার করলো: এ বাবু মেশায়, চুপচাপ বসে যান। তুফান ছাড়া আবার কোন শালার বাচ্চা আগে যায়? এ নয়নতারা এক্সপেস…

সত্যি আবুকে কেউ পারছে না। নদীর এক জায়গায় এসে নৌকো

চড়ায় লাগতেই নৌকো আটকে গেল। যাত্রীরা হৈ…চৈ ক'রে উঠলো। পিছনের নৌকোর প্যাসেঞ্জাররা হো…হো ক'রে চিৎকার করছে…হেরে …গেল… এক্সপ্রেস…লোকাল হ'লো।

তড়াক ক'রে আবু জলে নেমে নৌকো ঠেলতে লাগলো। চিকু হালের মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে লগি ধরলো। পিছনের নৌকোগুলো পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রছে। নয়নতারাকে ধ'রে ফেলেছে। এমন সময় হুস্ ক'রে নয়নতারা আবার জলে ভাসলো। প্যাসেঞ্জাররা আনন্দে কোলাহল করলো। চিকু বল্লে: যতই হোক মোশয়… এক্স…পে…স… লাইন যতই খারাপ থাক। সদরঘাটের বাঁধে নয়নতারা এক্সপ্রেসই প্রথম ধরলো।

সেদিন পীর পালামের পুজো। মাঝি-মাল্লারাই পুজো দেয়। বাড়তি পুজোর খরচ বাবুদের। নয়নতারা পুজো দিয়ে ফিরছিলো, ছোটবাবুর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা। মাথার কাপড় সরিয়ে নয়নতারাই কথা বল্লো: ছোটবাবু, একবার আমার কুঁড়েয় ছি চরণের ধুলো দিতে হবে…

—ছোটবাবু সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে অবাক চোখে বল্লে: কেন?

—রাস্তায় বলবার নয়, তাই। মুখ নীচু করলো নয়নতারা।

ছোটবাবু শুনেছে চিকুর বৌ একটু-আধটু লেখাপড়া জানে। শহুরে মেয়ে। চাল-চলন, বেশ-বাসও শহুরে। একবার ভালো করে তাকালো, নয়নতারার তারিফ করলো মনে মনে। বললো: আচ্ছা যাচ্ছি, পীরের থান থেকে ঘোরার পথেই যাচ্ছি।

এলোকেশীর কাছেই শুনেছে নয়নতারা। ছোটবাবুও এমনি বাইরে বাইরে ঘুরতো; নেশাভাঙ্ করতো। যেদিন বিয়ে দিয়ে সুন্দর টুকটুকে বৌ আনলো, বাস, আর যায় কোথা! বৌয়ের আঁচল ছেড়ে পনেরো দিন ঘর থেকে বেরোলোই না। সেই যে ছোটবাবু বদলে গেছে…সেই যে ঘরমুখো হয়েছে…

এলোকেশীর কথায় সেদিন নয়নতারা কান দেয়নি। আজ

ছোটবাবুর বৌকে দেখতে সাধ যাচ্ছে নয়নের। কেমন সে? কি মন্ত্র জানে?

দাওয়ায় আসন পেতে বসিয়ে সব বল্লে ছোটবাবুকে। বললেঃ ওকে যেমন করেই হোক ঘোরাতে হবে…। আপনাকে ধমক দিতে হবে.. ছুটি দিতে হবে…রাতেও যদি না ফেরে তো আমি কি নিয়ে থাকবো।

ছোটবাবু চিন্তিত হ'লো। দেখতে পেলো নয়নতারার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বললো, তুই ভাবিস নে বৌ আমি দেখ্‌ছি…কি করা যায়।

আধঘণ্টা বাদেই হাঁকডাক করে চিকু এসে হাজির।

—কি ব্যাপার নয়না?

নয়না একগাল হেসে বল্‌লে, আজ যে বাবার পুজো হ'লো। একটু পেসাদ মুখে না দিলে লৌকো বাইবে কেমন করে? অখ্যাত হবে না।

হো হো…ক'রে হেসে চিকু বলে; ও তাই বল্‌…আমি মনে…করি কি . না…কি…। শালা খোদ ছোটবাবুর তলব—"চিকু ঘরে যা হারামজাদা শুয়োরকির বাচ্চা…যা বল্‌ছি…নইলে জুতিয়ে খাল খিঁচে দেবো…" ওঃ শালা আমার যা ভয় হইছিলো…

নয়না প্রসাদ দিতে দিতে বল্‌লোঃ আজ কিন্তু ঘরে ফেরা চাই,…

—কেনে? আজ আবার কি হ'লো?

—আজ বাবার পুজো। সব্বাইকে আজ এক জায়গায় থাকতে হয়।

—নইলে?

—নইলে অমঙ্গল হয়!

—তা তোর খুব আস্পদ্ধা নয়না; এঁ্যা—শালা একেবারে খোদ ছোটবাবুকে উকিল ধ'রেছিস। আমরা শালা কাছ ঘেঁষতে লারি। ভয়ে বুক দুর্‌দুর্‌ করে। আচ্ছা ডাকাবুকো মেয়ে বটিস্‌.. হাত চাটতে লাগলো চিকু।

—তা যেটা বল্‌লাম, সেটা কানে গেল কি?

নয়নতারার সুরে ধমকের মেজাজ। আদেশের ঝাঁঝ।

—লিচ্ছি, মনে লিচ্ছি···

—আসবে ?

—হুঁ আসবো।

—হাতে পেসাদ আছে, মিথ্যে বল্লে কিন্তু···

নয়নতারা আজও সেজেছে। বড় টিপ আজও কপালে দিয়েছে। চিকুর হাতে জল দেবার সময় খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো নয়না। একবার তাকালো চিকু : বাব্বা ! যা সাজের বাহার তোর ? কি হইছে আজ ?

—টিপ্‌টা কেমন !

বিহ্বল হ'য়ে গেল মুহূর্তের জন্য চিকু। নয়না বললো : তোমার মতো··· ?

—হইছে। আমার মতো হইছে।

আবেগে জড়িয়ে ধরলো নয়নতারাকে। বললো, হ্যাঁরে নয়না ছোটবাবুর বৌ-এর কাছে পাঠ লিচ্ছিস্ নাকি ?

সেদিন বিকাল থেকেই মেঘ জমলো। সোঁ সোঁ ক'রে বাতাস বইতে লাগলো। দামোদরের বন্যায় বহু নৌকা লাগে মাল বোঝাই, যাত্রী বোঝাই। তাই নৌকাগুলো মিস্ত্রিরা সব মেরামত করছে— ঠক্·· ঠক্··· ঠকা···ঠক্···

ভালো ক'রে গা ধুয়ে পরিপাটি ক'রে সাজলো নয়না। শহরের মাইকে শোনা একটা গানের কলি গুণ গুণ ক'রে ভাঁজতে লাগলো। মাথার খোঁপায় কয়েকটা আকন্দ ফুল গুঁজেছে। একটা দমকা বাতাস্ খুব জোরে, কালবৈশাখীর ঘূর্ণি নিয়ে ছুটে চলে গেলো। নয়না ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজালো নয়না···।

পীরের থানে আজ আর যেতে পারবে না। প্রদীপ নিভে যাবে। নয়না একটা ধূপ নিয়েই পীরের থানে হাজির। সোঁ সোঁ ক'রে কান্নার মত সুর ভেসে আসছে। পীর পালামের পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়াগুলোর ভাঙ্গা গর্ত থেকে। প্রণাম ক'রে বসলো নয়না। টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি

পড়ছে। মনের অনেক না বলা কথা যেন ভাবনার জাল হ'য়ে পীরের তলায় ছড়িয়ে পড়ছে।

রাত এখন কতো বুঝতে পারছে না নয়না। আকাশের দিকে তাকালো। ঘরে ফিরে এলো নয়না। ছট্‌ফট্ করছে। তার চোখে ঘুম নেই। মনে চিন্তার জাল।

* * * *

অনেক রাত পর্যন্ত ছইগুলোকে নৌকোর ওপর বেঁধে চিকু গেছে নোঙরটা আনতে। নোঙরটাতে দড়ি বেঁধে নৌকোর সঙ্গে জুড়ে দিলে : শালার যা মেঘ ক'রেছে, যদি ঢল নামে তো লৌকো ভেসে যাবে···

টিপটাপ্ বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো। নিঃসঙ্গ নয় দামোদর। তার ভরা বাদরের জন্য অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করছে অনেক নৌকো। দেহে যৌবন এলে যেমন পেশি, শিরা, উপশিরা রক্তকোষের মধ্যে নাচন লাগে—ঠিক তেমনি যৌবনময় দামোদরের ভরা বর্ষায় নৌকোগুলো দোল খাবে। একটা বিদ্যুৎ চমকালো। এখুনি কড়্ কড়্ ক'রে বাজ পড়বে। চিকু ছইয়ের ভিতর ঢুকলো। ঢুকেই কার গায়ে যেন পা দিলো। কে যেন শুয়ে র'য়েছে। চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো : কে···কে···চোর···চোর···

একটা মেয়েলী টিন্‌ঠিনে কাঁচের চুরি বাজা হাত তার মুখটা চেপে ধ'রে মিনতি করলো : চুপ্ করো·· চোর নই···আমি ··তোমার নয়না।

—নয়না! অবাক হ'য়ে গেল চিকু, তুই···? এখেনে?

—হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে যেতে এয়েছি, ঘরে চলো···। একা, আমার ভয় করে না?

—যদি না যাই? চিকুর গলার আওয়াজ শক্ত কঠিন।

—তা হ'লে এখেনেই থেকে যাবো। একা আমার ভয় করছে···

—এখেনে কি থাক্‌বি?

—কেনে? বেশ তো ঘর বানিয়েছো! শুয়ে পড়লো নয়না।

—তোর মাথা খারাপ না, কি! এই লৌকোতে ব্যেভিচার! যাকে তেল সিঁদুর দিয়ে পুজো করি, তোকে লিয়ে তার ওপর লগর কেত্তন করবো মনে করেছিস?

বিদ্যুতের মতো উঠে পড়লো নয়না।—কি বল্‌লে? ব্যেভিচার…? আমি · না তোমার বিয়ে করা বৌ। আমাকে নিয়ে শুলে ব্যেভিচার হবে?

হাঁ…হাঁ চীৎকার করলো চিকু। ওখেনে পীর ঠাকুর আছে ছুঁস্‌নি… ছুঁস্‌নি…

তাকিয়ে দেখলো নয়না। অন্ধকারে দেখা যায় না। কিন্তু পা পড়তেই বুঝতে পারলো, কতকগুলো ফুলের ওপর পা দিয়েছে। পায়ের চাপ পেয়ে ফুলের পাপড়ি থেকে রস বেরিয়ে আসে। মাটির তৈরী ঘোড়া, হাতী আর কতকগুলো জবা ফুল। ছইয়ের এক কোণে জড়ো করা।

—তোমার ঠাকুরের নিকুচি ক'রেছে। ঠাকুর…পীর · তোমার ঠাকুরের বাবার নাম ভুলিয়ে ছাড়বো। ঠক্‌, জোচ্চোর শয়তান… ভণ্ড ··

রাগে কাঁপতে কাঁপতে নয়না ফুল, হাতী, ঘোড়াগুলোকে ছুঁড়তে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চিকু উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নয়নতারার গালে মারলো ঠাস্‌ ক'রে এক চড়। চুলের মুঠি ধ'রে টানতে টানতে ছই থেকে বের ক'রে নিয়ে আসে নয়নতারাকে।

—কি অসভ্য, জানোয়ার। আমাকে তুমি মারতে পারলে। বিয়ে ক'রে বৌ রেখে এলোকেশীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা, আমি কিছু জানি না! এক ঝট্‌কায় চুল ছাড়িয়ে নিলো নয়নতারা।

—নয়না। চিকু হাঁফাচ্ছে।

—চুপ্‌। ঐ মুখে আমার নাম ধরে ডাকলে তোমায় পুলিশে দেবো…

—যাচ্ছিস্‌ কোথাকে? ঘরে যা…হারামজাদী ·

—ঘরে যাবো? তোর ঘরে? তোর মতো লম্পট লটুম্বরের ঘরে · ?

—তোর বাপ যাবে, তিন কুড়ি টাকায় তোকে কিনেছি জানিস্‌ · তুই তো একটা বেবুশ্যে মেয়ে।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে নয়না। বেবুশ্যে মেয়ে…? কাঁদতে কাঁদতে নদীর বাঁধে আসতেই ডমরুর সঙ্গে দেখা! নয়নাই ডাকলে: ডমরু…, এত রেতে কোথাকে? আমার কাছে?

ডমরু চুপ। নয়না কাঁদছে : তিন কুড়ি টাকা দেবার মুরদ নেই, আর আমাকে পুষবি কেমন করে?

পরদিনই এলোকেশী তিন কুড়ি টাকা নিয়ে চিকুর কাছে গিয়েছিল।

—আমার দাদার সঙ্গে চলে গেছে নয়না বৌ? টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

চিকু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলো। টাকাটা নেয়নি। এলোকেশীকে ব'লেছে, তুই রেখে দে।

* * * *

উবু হ'য়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল নয়না। ডমরু লগির প্যাঁচ কষছিল। আবছা চাঁদের আলোয় ডমরুর ঝাঁকড়া চুলগুলো যেন ডুব সাঁতার দিয়ে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছিল। সেই প্রথম কথা বলে : —তোকে পই পই ক'রে বলেছি লতুন বৌ, ওটা একটা টোঁড়া। ওকে নিয়ে কোন মেয়েমানুষ নিশ্চিন্দি থাকতে পাবে না। কি আছে ঐ হাড়-বাগড়া চেহারাতে?

নয়না একটি কথাও বলেনি। শুধু হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে। চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে হাঁটুতে, সেখান থেকে টস্ টস্ ক'রে কাপড়ে পড়ছিল। চাঁদের আবছা আলোয় ডমরু সে কান্না দেখতেও পায়নি, মেজাজের ঘোরে শুনতেও পায়নি। নৌকোটাকে উজান ঠেলে এক প্যাঁচ এগিয়ে দিয়ে ডমরু বলে : সে-ই এলি, এতো দেরী হ'লো কেনে? তোকে কত ইসাবা ক'বেছি, এলোকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, দিলেশা গেলেছি। তা মেয়ের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। হুঃ—আমার সাথে পাল্লা দেবে চিকু? একটি প্যাঁচে ঝোল আমানি খাইযে দোবনি?

অসীম সাহস ডমরুব। পাথরেব মত দেহ। থামেব মত পা। নযনা চোখ ফিরিয়ে দেখছিল। হ্যাঁ শক্তি আছে অসুরের। এই মুহূর্তে নয়নার যেন ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, তার দুঃখটা তরল হ'য়ে নিস্তৃত হযে যাচ্ছে। তার বুকের ভিতর ভারী পাথরটা অনেকটা হাল্কা হ'যে গেছে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ডমরু বলে : আমার সঙ্গে লগিব প্যাঁচে পাববে না, ঘুন্নির খিদে মেটাতে পাববে? যখনই লদী ফুঁসে

ওঠে, ও শালা তো হাঁ ক'রে থমকে যায়! ক্ষ্যামতা আছে? কোঁসা নদীর বুকে চালাবার? হুঁঃ তখন এই ডমরু সদ্দারের কাছে সব শালা চামচিকে, ফড়িং…নয়নার মনে হয় সে যেন পথের নিশানা পেয়েছে! তার সাহস বাড়ছে, বুকের ভিতর ধুকপুকুনিটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এক চোখে সে ডমরুকে দেখছিল। একটা প্রচণ্ড প্যাঁচ দিয়ে নৌকোটাকে ও তরতরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শান্ত নদীর ছোট্ট ছোট্ট বালি-কাটা ঢেউ নৌকোর গায়ে লেগে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্ছে।

নয়না বলল: তা তুমি, আমার বাবার কাছে আগে যাওনি কেনে, তা হ'লে তোমার সঙ্গেই তো বিয়ে হ'তো।

ডমরু মুখটা বিকৃত করলে: ওঃ—আমার সতীরে—সব শালীকে আমার চাখা আছে! বিয়ে? এই মাঝিপাড়ায় ক'জন বিয়ে করা বৌ নিয়ে ঘর করছে শুনি? যাকে আমার পোষাবে না, আমি তাকে ঘরে রাখতে লারবো। যাকে ভাল লাগে তাকে লিয়ে ফষ্টিনষ্টি করবো। তার আবার আইনকানুনের কে ধার ধারে? নৌকোটা তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে। ডমরু নয়নার কাছে এসে নয়নাকে জড়িয়ে ধরে। ওর ভিজেমুখটা লোমশ বুকে ঘষতে ঘষতে বলে: —কেনে, তুই এখন কাঁদছিস কেনে? তোকে কি সুখে রাখি দেখিস্, তোকে লিয়ে সারারারাত আমি…

ব'লেই নয়নাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলতে যায়, নয়না ডমরুর লোমশ বুকে একটা কামড় বসায়।

—উঃ…

হিঃ হিঃ ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ে নয়না। কি হ'লো বুঝতে পারছিস? এটা ভালবাসার কাঁটা! গোলাপ ফুল তুলতে গেলে হাতে কাঁটা লাগে না!

ডমরু নয়নাকে ছেড়ে দিয়ে বুকে হাত দিয়ে যন্ত্রণাটায় প্রলেপ লাগায়। কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করতে পারে না। নয়নার হাসি দেখে ওকেও মুচকি হাসি হাসতে হয়; বলে: ও হো…হো…তাই বল্। ততক্ষণে নৌকোটা একটা চড়ে আটকে যেয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। নয়না চীৎকার করে উঠল: ডমরু…তোর লৌকো ঘুরপাক খাচ্ছে, ঘুন্নিতে

প'ড়েছে প্যাঁচ কষে ওর খিদেটা মিটিয়ে দে না ··

ডমরু এক ছুটে গিয়ে গায়ে যত জোর আছে লগি দিয়ে গাঁথে আর উচ্চারণ করে ঃ শালীর নিকুচি ক'রেছে···

পড়াং করে বাঁশখানা ভেঙে গেল। ভাঙ্গা বাঁশের খোঁচা লেগে হাত কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে ডমরুর। নয়না তখনও হাসছে। বলছেঃ যাঃ·· কি করলি? তোর কি খেয়াল নেই? একটা মরা নদী। চরে আটকে নৌকো ঘুরছে, আর তুই ঘূন্নির প্যাঁচ কষলি? জীয়ন্ত কি মরা—সে খেয়াল নেই তোর···হিঃ হিঃ হিঃ···

ডমরুর গা জ্বালা করছে। নয়নার কথাগুলো তীরের ফলার মত তার চামড়া ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে। তাতে বিষ মাখানো আছে; রক্তের জ্বালা দেখেই সে বুঝতে পারছে। ডমরুর মাথায় রক্ত উঠেছে টগবগ্ ক'রে ফুটছে যেন। শরীরের লোমকূপ থেকে আগুন বেরুচ্ছে। কানের দুপাশেও আগুনের জ্বালা। মুখে শুধু উচ্চারণ করে ঃ চ শালী···মজা দেখাচ্ছি···কামালপুরে যেয়ে···আর একটা কথাও বলেনি ডমরু। রাগে সে ফুঁস্‌ছে। শুধু গল্ গল্ ক'রে কথা বলে গেল, নয়না। তোর সঙ্গেই যদি আগে বিয়ে হ'তো, তা হ'লে মন দেওয়া নেওয়ার পালা সাঙ্গ হয়ে যেত এদ্দিন। যৈবন তো তর সয় না। এই দিনগুলো তো তার বিথাই গেল। যৈবনের যে খিধে সে খিদে আজও মেটেনি। বরং খাবার না পেয়ে পেটের হজম কলটা বিগ্‌ড়ে গেছে, তার নতুন স্বাদে নতুন খাবার দরকার। কিন্তু চিকু কি দিতে পেরেছে? জানিস্, রেলস্কুলে লেখাপড়া শিখেছি, টকি দেখেছি, নভেল পড়েছি। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম যার সঙ্গে বিয়ে হবে তাকে নিয়ে আমি কি করবো! কেমন নাস্তানাবুদ করবো। আমি জড়ভরত চিকুকে নিয়ে আমার সে সব সাধ আহ্লাদ চুপ্‌সে গেল। দেখি, তোকে নিয়ে কি করতে পারি। ডমরু একবারও তাকায় না। শুধু ভাঙ্গা লগির ঘায়ে নৌকোকে তরতরিয়ে এগিয়ে চলে, আর নয়নার উপর আক্রোশে ফুলতে ফুলতে ভাঙ্গা খোঁচে হাতটাকে খণ্ড বিখণ্ড ক'রে লাল রক্তে লগির গোড়াটায় ছোপ লাগায়।

কামালপুরে দিদির কুঁড়েয় যখন ডমরু নৌকো বাঁধলো তখন ভোর

হয় হয়। পূব দিকটায় ফরসা হয়ে কোদালে কাটা মেঘের নীচের দিকটায় সোনা রঙ ধরেছে। ডমরু ঘরে ঢুকেই দিদিকে হাঁক দেয়ঃ এই তোদের লতুন বৌ। কাপড় দে পরুক...।

বলে ডমরু বাইরে বেরিয়ে যায়।

ডমরুর দিদি খেঁদি একদৃষ্টে দেখছিল। ডাগর কালো কালো ভ্রূর নীচে উজ্জ্বল দুটি চোখ। কপালে একটি বড় টিপ। মুখের ডৌলটায় যেন কেমন মায়া জড়ানো। অনিদ্রায় ক্লান্তি কপালে, চোখে মুখে লেগে রয়েছে। খেঁদি একটুখানি দেখে নিয়ে বলেঃ আয় বৌ।

একটা কাপড় ছুঁড়ে দিয়ে খেঁদি বলেঃ তোর আর গলায় দড়ি জুটল না বৌ, তুই শেষকালে এই গুণ্ডাটার সঙ্গে জুটলি?

নয়না অবাক হয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে।

মুচকি হেসে খেঁদি বলেঃ পরে পরে সব বুঝতে পারবি! সেদিন সারাদিন নয়না চুপ করে কাটালো। খেঁদির একটি কথায় তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে।

খেঁদি অবশ্য খুব আদির যত্ন করে।

চুল বেঁধে দেয়, কপালে টিপ দেয়, সিঁথিতে সিঁদুর, পায়ে আলতা দেয়। আর মুচকি হেসে নয়নার চিবুক ধরে বলেঃ পোড়ামুখী, তোর চোখে কি ফাঁদ আছে, তুই তা জানিস না।

ডমরু দুপুরে একবার হন্তদন্ত হ'য়ে এসে নয়নাকে বলেঃ নয়না, সাজগোজ হ'য়েছে—চ।

—কোথাকে?

—সে কথায় তোর কাজ কি?

—না, আমি যাবো না। দিদির কাছ ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

ডমরু ঝাঁপিয়ে উঠলোঃ ও...রে...আমার সতীরে, দিদির আঁচলে গেরো হ'য়ে থাকবার জন্যে কি তোকে এনেচি?

নয়না এবার চোখ খুলে ডমরুর দিকে তাকায়। গুণ্ডাই বটে। পাথরের মত দেহ। এই দেহের একটি আছাড়েই অমন কত নয়না

গু:ড়ামারি হ'য়ে যেতে পারে। বলে : আমি যাবো না। আমাকে তুই এখনও চিনিসনি ডমরু।

ডমরু অমনি কাদার মত থলথলে হ'য়ে একগাল হেসে বলে : 'এই দেখ্ রাগারাগির কি আছেরে? মাথায় সিঁদুর দিতে হবেনি? নইলে…

—না, সিঁদুর অনেকদিন আগেই দিয়েচি। তুই যেখানে যাচ্ছিস্ যা।

—সে…আবার কি?

ডমরু বায়না ধরে : কেনে, অমন করছিস্ মাইরি, তোকে লিয়ে এলম, সে কি ঘরে ব'সে খ্যাঁট দেবার জন্যে? লক্ষ্মীটি—সোনা আমার ··

নয়না শেষবেশ বলে দেয় : কেনে নাকে কাঁদছিস্ ডমরু? তুই যেখ্যান যাচ্ছিস যা · আমায় এখানে একা থাকতে দে।

সন্ধ্যেয় আর ডমরু ফেরেনি। খেঁদির স্বামী ঘরে নেই। গেছে মালবোঝাই নৌকো নিয়ে সদরঘাটে। মাঝে মাঝে প্রায়ই তাকে যেতে হয়। গুটি তিনেক কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে খেঁদির ছোট্ট সংসার। খেঁদি গল্প করে : মাঝে মাঝে ডমরু এসে উৎপাত করে। লটবরের বাবা থাকলে বাইরে চুপচাপ, নইলে আমার মরণ। অবিশ্যি লতুন একটাকে নিয়ে এলে আমার বাঁচোয়া…বলেই খেঁদি হাসে।

—তোমার বাঁচোয়া?

নয়না অবাক চোখে তাকায়। কি বল্‌ছে খেঁদি?

—হাঁ! একদিন মনের অন্ত ছিল, সেদিন চেয়েছিনু কোলের ছেলে নইলে মেয়েমানুষের সুখ কি? লটবরের বাবা যে পঙ্গু, নামেই পুরুষ মানুষ। একটা পাথর বই তো কিছু লয়।

খেঁদির চোখদুটো জল টল্‌টল্ করছে। সে চোখের ভাষা নয়না এক আঁচেই ধ'রে ফেলেছে। বলে : তুমি তা হ'লে ডমরুর দিদি নও ··? খেঁদি মুচ্‌কি হাসে। কোন কুলে ড্যাগরার দিদি আছে শুনি? অবিশ্যি লটবরের বাপের কাছে আমি ওর দিদি ··।

সমস্ত জিনিষটা পরিস্কার হ'য়ে যায় নয়নার কাছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো একটা পঙ্গু অসহায় মানুষ। যার জীবনধারণ

করাটাই একটা অভিশাপ। বেঁচে থাকাটাই একটা দুঃসহ যন্ত্রণার। সেই অভিশপ্ত জীবনের মাশুল গুণতে হচ্ছে লটবরের বাবাকে। সে বেঁচে আছে লটবরের বাপ হ'য়ে, বেঁছে আছে লটবরের মায়ের স্বামী হ'য়ে। কিন্তু ঐটুকুই। ওদের সংসারের ভিতরে বহে চলেছে ক্লেদাক্ত নরকের দুর্গন্ধময় অন্তঃসলিলা। নয়নার জীবনটা যেন দূষিত বাষ্পে আচ্ছন্ন হ'য়ে আসছে।

খেঁদি ব'লে চলেছে : নে লো ভাল ক'রে সাজ, একটি রাত বইতো লয়। খেঁদি নিজেও সাজে। আশ্চর্য রকম উন্মাদনা।

দুজনে নদীতে স্নান করতে গেল। অনেক আগেই সেখানে পাড়ার বৌ-ঝিয়েরা জড়ো হ'য়েছে।

সবাই মুচ্‌কি ··মুচ্‌কি হাসছে।

একজন বুড়ি জিজ্ঞেস করে : ও···মা···এ কোত্থেকে এল· লো ?

একজন উঠ্‌তি যৌবনের মেয়ে, খুব মুখরা, বললে : এটা...লতুন শিকার বুঝি ?

নয়নার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে ·। বলে : দিদি···চলো·· এখেন থেকে পালিয়ে চল।

—সেকি লো ? পালালে আমাকে আস্ত রাখবে না কি ডমরু ড্যাগরা ? কেটে কুচিকুচি করবে না ?

সন্ধ্যের সময় নয়না বলে : কিন্তু দিদি, তুমি এই পাপ নিয়ে কেমন ক'রে বাস করছো, আমার যে দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে।

খেঁদি একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বলে : পাপ, কোথায় পাপ ? আমার যৈবনের খিধে মিটিয়েছে ঐ ডমরু ড্যাগরা। তুই তার কি জানবি ? বিয়ের পর এক বছর ছটফট ক'রেছি, লটবরের বাপকে নিয়ে কত চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু ওটা যে হাড়হাভাতে, একটা ফোঁপরা কাঠের ঢেঁকি, তা টের পাইনি। সে সময় আমার মনের যন্তনা যদি বুঝতিস্। তারপর একদিন ডমরু ড্যাগরা এল মালের লৌকতে। বাস্। আমি সব পেয়ে গেলম, ও আমাকে সব দিল···আমি ডুবে গেলম। পাপ·· ? হুঁ—

নয়না ছিঃ ছিঃ ক'রে উঠ্‌তেই খেঁদি রক্ত চোখে বলে : ছিঃ ছিঃ কেনে ?

মনের খিদে মনে চেপে রেখে নিজের গলায় ছুরি দেব কেনে? নয়নাকে দুহাতে চেপে ধ'রে খেঁদি ঝাঁকানি দেয়ঃ বল্…তুই…বৌ…তুই…বল্ তাতে কি আমি বাঁচতুম। তাতে কি নটবরের বাপকে সুখে ঘর করতে পারতুম? ঐ নটবর, বিন্দি, কিট্টো…এদের কি পেতুম…? নয়না একদৃষ্টে চেয়ে বলেঃ এতে কি তুমি সুখী হ'য়েছ?

—হ্যাঁ…একশবার! আর আমার সুখ-শান্তির খোঁজ তোকে কে নিতে বলেছে, তুই কি চিরকাল এখেনে থাকবি? তুই তো দুদিন বাদেই ফুরুৎ ক'রে উড়ে যাবি…।

সেদিন খেঁদি খুব কাঁদলো। মনের কথা বলবার কোন লোক না পেয়ে ও হাঁপিয়ে উঠেছিল। নয়না লক্ষ্য করে সংসারের মধ্যে খেঁদি কেমন ক'রে মনের কানা গলিতে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে। বেচারা নটবরের বুড়ো বাপ তার কোন হদিশই পায় না। তাকে আড়ালে রেখে ডমরু আর খেঁদি নিজেদের খোরাক দিব্য ক'রে নিচ্ছে। আশ্চর্য এই পৃথিবী; আশ্চর্য মানুষের চরিত্র।

অনেক রাতে নয়নার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কে যেন তাকে চেপে ধরেছে। নয়না এক ঝটকায় ঠেলে ফেলে দিতে চায় কিন্তু জগদ্দল পাথরের মত ভারী দেহটা তাকে দলে পিষে একটা কাদার ডেলাতে পরিণত করতে চায়। নয়না চিৎকার ক'রে ওঠে; একটা শক্ত হাত ওর মুখে এসে থাপ্পড় মারে। নয়না শেষ চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে বিছানায় লুকানো কাটারীটা হাতে করার চেষ্টা করে। একসময় হাত ঢুকিয়ে বিছানার নীচ থেকে কাটারীটা তুলে নেয়। ততক্ষণে শক্ত পাথরটা আরও জোরে চেপে বসেছে। দস্যুটার দাঁতে কড়মড়্ ক'রে শব্দ হ'লো। ওর নাকের দুপাশে গালের ওপরে গরম নিঃশ্বাস তীরের ফলার মত বিঁধে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। একমুহূর্ত দেরী না ক'রে হাতের কাটারীটা কালো পাথরের ঢিবিতে এসে মরণ কামড় দিতেই যেন পাথরটা নড়ে উঠ্‌লো। একটা চিৎকার করে পাশে ধব্ ক'রে পড়ে গেল। সাপের বাঁধন দেওয়া নয়নার হাত ও বুকটা ছাড়া পেল। নয়না উঠে পড়ে দরজা খুলে ছুট দেয় উর্ধ্বশ্বাসে।

ছোবল খেয়ে কালো পাথরটা চেঁচাচ্ছে। ককিয়ে উঠ্‌ছে; তার গলার নল বেয়ে মুখের গর্তে এসে থম্‌কে যাচ্ছে। নয়না দরজায় এসে একবার পিছন ফেরে। কাপড়টা গায়ে তুলে নিয়ে আলুথালু হয়ে ছুটলো।

—দিদি...দিদি...

—কে?

—আমি, নয়না...

—নয়না, তুই আবার এসময় উঠে এলি কেনে? কপাট ঠেলে ছিটেবেড়ার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে আসে খেঁদি।

—একি, বৌ; তুই হাঁপাচ্ছিস্ কেনে? কি হ'য়েছে তোর?

—আমি থাকতে লারবো দিদি। আমি পলেমপুরে ফিরে যাচ্ছি।

—সেকি, এত রেতে? কি বলছিস্, তুই?

খেঁদির স্বরে কাকুতি-মিনতি। মুখে-চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন। বললে: আজকের রাতটা তুই থাক্ নয়না। লটবরের বাবা এই খানিকক্ষণ হ'লো ফিরেছে। বেচারার জন্যে কষ্ট হয়। তুই চলে গেলে ওর চোখের সামনে থেকে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে ঐ লম্পটটা...

নয়নার দুঃখ হ'লো। কিন্তু না। সে আর একমুহূর্তও এখানে থাকতে পারছে না। তার দম বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। বলে: না...দিদি...আর সে এখনই তোমায় বিরক্ত করতে পারবে না তার ব্যবস্থা আমি করে এয়েছি...বলেই হাতের কাটারীটা তুলে দেখায় নয়না।

—কি করেছিস্ তুই? ওরে তুই একি করলি নয়না? বলেই চিৎকার করে ওঠে খেঁদি।

—তুই শেষকালে ডমরুকে খুন করলি ?

—না। একেবারে খুন করিনি, জখম করেছি। তুমি এবার লটবরের বাপকে নিয়ে আরামসে রাতটা কাটাও দিদি। আর তোমাকে কেউ লটবরের বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি চলি।

খেঁদি উবু হয়ে বসে দরজার চৌকাঠেই হাউ হাউ করে কাঁদতে

লাগলো। ঘরের ভিতর থেকে লটবরের বাবা সাড়া দেয়ঃ কি হ'লো বৌ…

—ডমরু কোথায় চোট লাগিয়ে এসেছে গো রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে নয়নাকে বলেঃ তুই চলে যা নয়না…এখেনে আর একদণ্ডও লয়। তুই পালা—নয়না যাবার সময় শুনতে পাচ্ছেঃ তুমি উঠে এলে কেন? কেউ নেই ..ডমরু মাথায় চোট নিয়ে ফিরে এসেছে।

খেঁদি তার স্বামীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিছু হয়নি। জীবন যে রকম চলবার ঠিক চলছে, দিন যে রকম যাবার ঠিক যাচ্ছে, সময় যে রকম কাটবার ঠিক কাটছে। খেঁদি তার স্বামীর কাছে অনুগত পতিগত প্রাণা। পঙ্গু, অসহায় স্বামীর দুর্বলতা সে ঢেকে দিয়েছে অপৌরুষের অভিশাপ থেকে তাকে বাঁচিয়েছে। এই দুজনের মাঝে যে নিজেদের খাদ সৃষ্টি হ'য়েছিল তা পূর্ণ হ'য়ে গেছে। ডমরুর সাহচর্যে গভীর খাদের মধ্যে শক্ত গ্রানাইটের পাথর জমে উঠেছে। সারাজীবনে ওদের লুকোচুরি কেউ বুঝবে না, কেউ জানবে না, কেউ শুন্‌বে না।

হাতে কাটারী নিয়ে নয়না ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। মাথার ওপর রূপালী চাঁদ, দূরের শোভা নিয়ে আসর জাঁকিয়ে ব'সেছে। রূপালী আলোর স্রোত ছিঁড়ে নয়না ছুটে চলেছে মাঠ ভেঙ্গে।

ভোরের সময় বাইরে এসে আঁতকে ওঠে ছোটবাবুঃ

—একি মাঝি বৌ, তুই?

—হ্যাঁ। কাটারীটা ছোটবাবুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে ব'লেছিল নয়নাঃ হ্যাঁ…আমি। এই লাও কাটারী…আমার গলাটা কেটে দু-আধখানা ক'রে দাও…আমি বাঁচতে লারছি·· আমি বাঁচতে চাই না …আমি বাঁচতে পারবো নি—বলেই হু হু ক'রে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ছোটবাবু একেবারে থ'।

সমস্ত শুনে বলেঃ চ, এখান থেকে পালিয়ে চ। লক্ষ্মীপুরের বাড়ীতে 'ঝি' গিরি করবি।

নয়না চলে যাবার পর চিকু কেমন যেন হ'য়ে যায়। যে চিকুকে

ঘর বাঁধতে এত সাধ্য সাধনা করল নয়নতারা, সেই চিকুই নয়না যাবার পর ঘর নিল। এখন সন্ধ্যের পর আর কেউ চিকুকে ঘাটে দেখতে পায় না। কারও সঙ্গে কথা বলে না চিকু। সমস্ত দিন উদাস হ'য়ে কি যেন ভাবে। একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে বদ্ধ পাগলের মত যেখানে সেখানে ব'সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটায়। অস্থির হ'লে তাড়ি, পাঁচুই খায়, বুঁদ হয়ে ঘরে পড়ে থাকে।

দামোদরের বিচিত্র জীবনের রোজনামচায় সে লক্ষ লক্ষ লোককে পার ক'রে দিয়েছে। জীবনের স্রোতে এগিয়ে দিয়েছে কতো যাত্রীকে। কতো পথিককে। কত শীত-বর্ষায়, কত হেমন্ত-বসন্তে, কত তীর ভাঙ্গা স্রোতে আর চর জাগা টানে। আজ সে ক্লান্ত, আজ সে অসহায়—বাক্‌হীন।

তার নৌকোটার দিকে সে কখনও তাকিয়ে থাকে। কখনও হাত বুলোয়। কখনও মাথা রেখে চোখের জল ফেলে। সেদিনই রাতে ঘুমোতে না পেরে কুঁড়েয় ফিরে আসে চিকু। কিন্তু নয়নাকে দেখতে না পেয়ে দিশেহারা হ'য়ে যায়; হাঁকে: নয়না নয়না·· তুই ফিরে আয়···আমি এসেছি···

দামোদরের চরে ছুটে ছুটে হাঁফিয়ে যায় চিকু। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদে নয়না···তুই আয়। মাথার চুল ছিঁড়ে, নিজের গালে চড় মেরে শোধ নেয়। নয়নাকে এই মুহূর্তে না পেয়ে চিকু যেন বাঁধভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মত দুর্বার হ'য়ে ওঠে। ঘরে এসে একটা কুড়ুল নিয়ে নৌকোটার দিকে ছোটে। গালাগাল দেয় অশ্রাব্য ভাষায়। শালার নৌকোর নিকুচি ক'রেছে···ঐ শালার জন্যেই তো···আজই চেলিয়ে কুচি কুচি করবো। নয়নতারা এক্সপ্রেস লেখাটায় ঢলে পড়া চাঁদের আলো পড়ে জ্বল্ জ্বল্ করছে। চিকু তার ওপর সজোরে কুড়ুলের ঘা বসায়। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা যেন ঠং করে চিৎকার ক'রে ওঠে। কুড়ুলটা নৌকোর হাঁমুখে বসে যায়। কিন্তু কুড়ুলটাকে আর টেনে তুলতে পারে না। যেন নৌকোর দূষিত বিবরে বিষের ভারে ওটা জর্জরিত হয়ে আটকে গেছে। চিকু অসহায়ের মত মাথা ঠুকে রক্ত বার করলো, আর অজস্র কাঁদলো।

আবু এখন নৌকোটা মোছায়, তেল সিঁদুর দেয়, পুজো করে। পুজোর সময় চিকুকে খোঁজে : চলো গুরু, তুমি না গেলে যে লৌকো চলবেনি। আবু হাত ধরে ধরে চিকুকে টেনে নিয়ে যায়। বলে : লেখাটা ঠিক আছে তো···দেখ তো গুরু···তুমি সেদিন কুড়ুলে করে চেলিয়ে এখেনটা দরজা করে দিয়েছ ? চিকু শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যেন ওর বলা কওয়া সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। যেন ওর মনের ভাষা, বুকের ব্যথা কেউ বুঝলো না। কেউ বোঝার চেষ্টাও করে না।

এলোকেশীর বাবা এসেছে। বলে—চিকু এলোকেশীকে নে কোন টাকা লাগবেনি। এলোকেশী তোকে পেলে আর কাউকে চায় না।

এলোকেশী এসে ঘর গোছায়। রান্নাবান্না করে। বাসন মাজে··· চিকুর কোলের কাছে ভাত ধরে দিয়ে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করে ওর মুখোমুখি বসে। কিন্তু চিকু নির্বাক। মুখ তুলে চায় না। কথা বলে না। কোন জিনিস দিলে খায়, না দিলে না খায়।

এলোকেশী ফাঁদ পাতে, জাল বিছোয়, দড়ি ফেলে, পরিপাটি করে গা ধোয়, পোযাক পরে—ছাপা শাড়ি, ছাপা ব্লাউজ, কপালে টিপ, চুলে ঝুঁটি। হাসি হাসি মুখে চিকুর সামনে এসে দাঁড়ায়।

চিকু মাদুরটা পেতে বিশ্রাম করে। এলোকেশী সেখানে বসে মাথায় হাত বুলোয়। ঠাণ্ডা হাত কপালে রাখতেই চিকু হাত দিয়ে চেপে ধরে চোখ বুজে বলে : এলো···

এলোকেশী কোন সাড়া দেয় না। গরম দু' ফোঁটা চোখের জল ওর কপালে পড়ে। চিকু চোখ খুলে বলে : —একি ? এলো তুই কাঁদছিস্··· ?

এলোকেশী কোন সাড়া দেয় না। নিবিড় সেবা-যত্নে সে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। চিকুকেও ডুবিয়ে কাছে টানতে চায়। এলোকেশী বলে : তুমি মিছেই সে পোড়ারমুখীর কথা ভাবছো। দাদাকে নিয়ে সে তো ঘর বেঁধেছে··· !

চিকু চমকে ওঠে। বুকটায় যেন কেউ কুড়ুলে ক'রে আঘাত করে। এলোকেশী ফাঁদ ছড়িয়ে দেয় : তুমি জানো না···তোমার এখেনে আসার

আগেই…আমার দাদার সঙ্গে কষ্টি…নষ্টি…ছিল নয়নার। চিৎকার ক'রে ওঠে চিকু: কি বলছিস্? ছিঃ—চোখ বেঁকিয়ে কঠিন হ'য়ে জবাব দেয় এলোকেশী। তার মোক্ষম অস্ত্রটি তীক্ষ্ণ ধারালো এবং বিষ মাখানো। বলে: ছিঃ? তবু যদি নিজের চোখে না দেখতুম। কপাল থেকে এলোকেশীর নরম হাত দুটোকে নিয়ে চিকু মোচড় দেয়। এলোকেশীর হাত দুটোকে আরও কাছে টেনে আনে। ওর মুখটা চিকুর মুখের ওপরে ক্রমশ ঘন হ'য়ে আসছে। এলোকেশীর বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। তার ফাঁদে আজ চিকু একেবারে আবদ্ধ, কামনার শরে আজ চিকু আচ্ছন্ন …শতবিদ্ধ। এলোকেশী এবার জাল গুটোবে। কিন্তু চিকু এলোকেশীর হাত দুটোকে মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে দেয়। এলোকেশী অব্যক্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করে: উঃ…কি করছো… লাগে না?

—তুই নিজের চোখে দেখেছিস… ?

—না তো কি মিছে কথা বলছি?

—বেরো। তুই মিথ্যে বলছিস। বলেই এলোকেশীকে দুহাতে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পালায় চিকু। এলোকেশী হাতে মোচড়ের যন্ত্রণা আর মনে শরবিদ্ধ ক্ষতটা নিয়ে কাতরাচ্ছে। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। জাল তার শতছিন্ন। শিকার পালিয়েছে।

নয়নতারা এক্সপ্রেসের সিঁদুরে রেখাগুলো ঘষে ঘষে তুলছে চিকু। এলোকেশীর বাপ আসতেই চিকু কথা বলে: ধুমধাম ক'রে বিয়ে দিতে পারবে কি? টাকা খরচা করতে পারবে কি?

—হ্যাঁ, কেনে পারবো না। আষাঢ়েই ভালো দিন আছে। এলোকেশীর বাপ নাচতে থাকে।

রাতে পরিপাটি ক'রে বিছানা করে এলোকেশী। খাইয়ে দাইয়ে চিকুকে বলে: কাল থেকে আর আসবোনি। পিসিকে খবর দিয়েছি…

চিকু অবাক হয়। এলোকেশীই বলে: বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে গেলে আর দেখা দিতে নেই, একেবারে সেই উবুদোলায় মুখ দেখানির সময়…ব'লেই মুচকি হাসে।

চিকু গম্ভীর হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এলোকেশী

সত্যই চলে যায়। সামনের আষাঢ়ে বিয়ে। এই আহ্লাদে তার দেহে যৌবনের আষাঢ়ে অনেক আগেই ঢল নেমেছে।

পিসি এসেই চেঁচামেচি সুরু ক'রেছে : রাক্ষুসী, ডাইনী…কদিন বাছার ঘরে এসে বাছাকে চিবিয়ে খেলে! কি কুক্ষণে ডাইনীটাকে ঘরে এনেছিনু…এলো বেশ মেয়ে…চিকু… ও চিকু…চালটাল চারটি জোগাড় কর। আসেদ্ধ চাল কোথায় পাবি দেখ্।

চিকু ঝাঁপিয়ে উঠলো : তুমি চুপ করো পিসি…যার বিয়ে…তার মনে নেই…পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই…

পিসি ফের চেঁচায় : দাঁড়া…তোর মজা দেখাচ্ছি, তোর ওষুধকে আজই আনছি। পিসি নিজে যেয়ে এলোকেশীকে ডেকে নিয়ে আসে। দুপুরে ভাত খেতে এসে এলোকেশীকে দেখে চিকু খেপে গেল। —পিসি ‥ এলো কেনে এখেনে?

—আমি এনেছি, দেখতে সাধ গেছে! তোর কি? চিকু আধ খাওয়া করে উঠে যায়। সারাদিন নৌকোয় মাথা দিয়ে পড়ে থাকে।

সন্ধ্যের সময়ও চিকু ফেরে না দেখে ভাবনা হয়। এলোকেশী খুঁজতে বেরোয়। নৌকোয় এসে দেখে চিৎ হয়ে শুয়ে চিকু। এলোকেশী ডাকে : —চিকু…

—এ্যাঁ… কে‥ এলো?

আজ সন্ধ্যেয় চাঁদ নেই। আবছা অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না এলোকেশীর। কিন্তু বুঝতে পারছে চিকু কাঁদছে। চিকুর কাছে গিয়ে এলো বসে, মাথায় হাত দেয়। চিকু পরম আদরে তার হাত দুটি চেপে ধরে ভিজে চোখের উপরে নিয়ে আসে। চিকু কাঁদছে। এলোকেশীর নরম তারায় জলের সোঁতা লেগে জব্‌জব্ করছে, তার হাতেও চিকুর ভাসন্ত পাতায় উপছে পড়া জলের ছলকানি। কি মিষ্টিই যে লাগছে। এলোকেশীকে চিকু আজ গভীরভাবে বুকে টেনে নেয় বলে : এলো, তুই যে জন্যে ঘুরছিস্ তা হবে নি। নয়না আমার হাড় গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে…

— কিন্তু সে তো তোমার মত একলাটি নেই…দাদাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে…দাদাকে সে ভালবাসে…

—তা বাসুক। আমি পারবো নি এলো, তুই কিছু মনে লিস নি···তুই এখেন থেকে যা···

এলোকেশীর মুখটাকে দুহাতে চেপে ধরে চিকু বলে : কিছু মনে লিস নে···তুই আমার জন্যে অনেক করেছিস···এবের তুই যা এলো···

এলোকেশী ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। চোখের জল মোছে। চিকু ডাকে : শোন্ ··এলো···এলো শুনে যা...

এলোকেশী দাঁড়ায়নি। অন্ধকারের মধ্যে রুদ্ধ কান্নার আবেগে গুমরে গুমরে ও মরতে থাকে। একটিও কথা না বলে এলোকেশী চলে যায়।

* * * *

ছোটবাবুর বৌকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল নয়না। বন্দনা বলে : কি বৌ, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছিস বল্‌তো?

নয়না চোখের পাতা দুটো নীচে নামায়। বলে : বল্‌বো বৌদিমণি ···সেকথা একদিন বলবো!

ছোটবাবুর মা এসে বলে : অ···মা। বৌ বুঝি এখেনে ছোটর সঙ্গে গল্প জুড়েছিস? তুই তোর কাজ দেখে নে বাছা। তারপর গল্প করবি। সরোজ···সরোজ···সরোজ মানে ছোটবাবু।

মায়ের ডাকে ছেলে আসে।—কি···মা···?

—আমি বলছিলুম, ছোটবৌকে নিয়ে একবার বর্ধমান যা, ডাক্তার দেখিয়ে আন দেখি।

—ওর কি হ'য়েছে, তাই যে ডাক্তার দেখাতে যেতে হবে! বন্দনাও বলে : মা, তোমার কি এছাড়া কোন কথা নেই! কিছু হয়নি আমার···

—তোমার কি হয়েছে, তার তুমি কি বুঝবে বৌমা! আমার মত ছেলেপুলের মা হও···তারপর বুঝতে পারবে।

—হ্যাঁ—হাঁ আজই বিকেলে নিয়ে যাবো।

বলেই সরোজ বন্দনার দিকে চোখ টিপে চুপ থাকতে বলে।

বন্দনা সেটা বুঝতে পারে। নয়নার খুব মজা লাগছিল। মা চলে গেলে বন্দনা বলে : তুমি তো এসবই খুঁজে বেড়াচ্ছ···

সরোজ বন্দনার নাকে একটা মোচড় দিয়ে বলে : কি করবো বলো, নইলে তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ যে পাড়া মাথায় করবে। এখন থেকে ভাবনা ধরে গেছে বোধ হয় আমাদের আর ছেলেপুলে হবে না।

ব'লেই দুজনে হাসতে থাকে। সরোজ বলে : নয়না বৌ…

—ছোটবাবু…

—তুই তোর ছোট বৌদিমণির কাছে থাকবি। বুঝলি ?

—আচ্ছা।

—আর শোন।

—কি ?

—কাছে আয় না।

ব'লেই ছোটবাবু নয়নার কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে :

—তোর কাজ হবে, তোর ছোট বৌদিমণিকে যেন তেন প্রকারেণ ফাঁক পেলেই আমার কাছে নিয়ে আসা…

বন্দনা শুনতে পেয়েছে। ইস্…

সরোজ চোখ কপালে তুলে বলে : ইস্ মানে…তুমি দেখেছি সারাদিন মায়ের সঙ্গে ঘুর্ ঘুর্ ক'রে বেড়াচ্ছ! বলি মা কি তোকে বিয়ে করে এনেছে…মারবো মাথায় গাঁট্টা জানিস্…

বন্দনাও শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে বলে : বে-শ। চলে আয় …কার গায়ে কত শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক। বলে বন্দনাই সরোজকে কাতুকুতু দেয়, সরোজ তির্তির্ ক'রে নাচতে থাকে ; এই…বন্দি‥ কি হচ্ছে ‥মাইরি…কাতুকুতু লাগছে…ভাল হবে না হ্যাঁ—।

—আজ্ঞে মশাই, লাগার জন্যেই তো দেওয়া…আর আমার সঙ্গে লাগতে আসবি।

সরোজ ঘরময় বন্ বন্ ক'রে ঘুরছে, আর বন্দনা কাতুকুতু দি'চ্ছে। এক সময় সরোজ বন্দনার বেণীটা ধরে এক ঝটকায় ওকে কাছে টেনে ওর হাত দুটো চেপে ধরে।

—এই…ছাড় ‥ছাড়…লাগছে…

—হুঁ…এবার ? বলেই সরোজ হাত ছেড়ে দেয়। বন্দনার

বেণীটা সরোজের গলায় জড়িয়ে ছিল, সেটা চেপে ধরে বলে : আচ্ছা কেন আমার সঙ্গে লাগতে আসিস্ ··?

—বাব্বা, হাত নয় তো শক্ত কঞ্চি···

—আর তোর হাত যে বাখারি···

—তুই একটা সাঁওতাল···

—তুই একটা বাউরী···

—তুই মোষ···

—তুই ষাঁড়···

—তুই···তুই···

—তুই···তুই···

বলেই দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। সরোজের খেয়াল হয়; আরে ···এখানে যে নয়ন বৌ আছে, সে খেয়াল ছিল না তো? কি আমাদের সব দেখে ফেললি বুঝি···?

নয়না অবাক চোখে দেখছিল। ওর চোখের তারা দুটো চরকির মতো ঘুরপাক খেয়ে একবার বৌদিমণি একবার ছোটবাবুর কাছে ফিরছিল। পরে এক সময় ও ওদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয়। মাঝে মাঝে বৌদিমণির পক্ষে কথাও বলেছে: হ্যাঁ···বেশ···বেশ হয়েছে··· বৌদিমণি ধরলে···তোমাকে ধরলে ··

কখন যে নয়না ওদের হাসিখুশির মেজাজে নিজের মনকে ডুবিয়ে দিয়েছে বুঝতে পারেনি। বন্দনা ওকে ডাকে : নয়না—

—উ—

—শোন্···কাছে আয়···

নয়না কাছে আসে।

—চিকু তোকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

নয়না চুপ ক'রে পা দিয়ে আঁচড় কাটে। ঘাড় নামিয়ে চুপ থাকে। বন্দনা দেখতে পায় চোখের কোণ বেয়ে জল উপছে পড়তে চাইছে। নয়না চোখ দুটো তুলতেই চোখ ভর্তি জল ঢেউ খেয়ে কানায় ছোপ দেয়। বলে: বৌদিমণি, সে কথা তোমাদের শুনে কাজ নেই। আমাদের আবার জীবন।

ছোটবাবু বলে : কেনো তোদের জীবন কি জীবন নয়? তোরাও মনের মানুষকে ভালবাসিস্, আমরাও বাসি। তফাৎ শুধু আদব কায়দা…

—ভালবাসতে কেউ জানলে তো বাসবে ছোটবাবু।

—আমি কালই ঘাটে যাচ্ছি নয়না, চিকুর কান ধরে থাপ্পড় লাগাবো…

নয়না জোড় হাত করে—না ছোটবাবু, আমার জন্যে আপনাকে কিছু করতে হবে নি ; চিকুকে কিছু বলার দরকারও নেই। ওতে কখনও মনের মিল হয় না ছোটবাবু…

—তা বেশ।

ছোটবাবু একটা সিগ্রেট ধরায়। বন্দনার গালে একটা টুসকি দিয়ে বলে : চলি মহারাণী ! মাপ কিজিয়ে। একবার বাইরে যেতে হবে…

—কিন্তু একঘণ্টার মধ্যে ফেরা চাই।

বন্দনার চোখের কোণে আনন্দের ফোয়ারা। সে ফোয়ারার স্পর্শ নয়নাও পেল।

ছোটবাবু চলে গেলে নয়না বলে : বৌদিমণি…

—বল্…কিন্তু করছিস্ কেন ?

—তুমি দাদাবাবুকে যাদু করলে কেমন করে ? উপছে পড়া জল ঝরে পড়লো গাল বেয়ে।

বন্দনার মায়া হলো ! তুই কি চিকুকে কাছে রাখতে পারছিস্ নে বৌ ?

নয়না আঁচল চাপা দিয়ে চোখ মুছে কঠিন হলো। সংযত ও শান্ত কণ্ঠে বলে : না, কিছুতে না…অনেক করেছি…

—না

—কিন্তু কেন ?

—নৌকো।

—নৌকো কি ?

—নৌকো নিয়ে দিন রাত পড়ে থাকে।

এত দুঃখেও বন্দনা হেসে ফেলে। তুই পাগল হ'য়েছিস্ নয়না, বৌ

ফেলে নৌকো নিয়ে পড়ে থাকে? আরও জোরে হাসতে থাকে বৌদি-মণি। ওর সোনার রিম দেওয়া চশমার ফাঁকে চোখের তারাগুলো ডুব সাঁতার দিয়ে উঠছে আর নামছে। বুকের আঁচল খসে পড়তে পড়তে চুড়ো হুটোয় আটকে রয়েছে। অনাবৃত বুকের দুধবরণ জমিতে চিক হাড়টা হাসির ছন্দে ওঠা নামা করছে। নয়না দেখছিলো: বৌদিমণির যৌবন এখন ভরা দামোদরের মত কানায় কানায়। ছোটবাবু, তাই না মনের আনন্দে দোল খাচ্ছে।

নয়না বলে: হেসো···না বৌদিমণি! তুমি কটা মানুষ দেখেছ··· কজনের খপর রাখো···?

বন্দনা হাসি থামিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে: সে কি লো! আমি কি তোর ছোটবাবুকে ছেড়ে অন্য একজনকে ধরবো বল্‌তে চাস্?

—না, তা কেনে···। কিন্তু চিকুকে তুমি দেখনি···তাই বলছ।

বন্দনা হাসতে হাসতে চোখে জল এনে ফেলেছিল। হাত দিয়ে মুছে বলে: আসল কথা হলো···তুই বাঁধতে পারিস নি!

সেদিন নয়না সমস্ত কথা ছোট বৌদিমণিকে বল্‌লো। তার জীবনের যে রস শুকিয়ে গেছে, একথা বন্দনা বুঝতে চায় না। বন্দনা বলে: ধৈর্য ধর নয়না। সে একদিন ফিরে আসবেই—আসবে।

ছোটবাবু পরদিন ঘাটে যাবে, নয়নাকে বলে: চল্ তোকে পৌঁছে দিই···

নয়না বললে: এখেন ছেড়ে আর কোথায় যাবো ছোটবাবু? নয়না একা রইল, বন্দনা ও সরোজ গেল কলকাতায়, ডাক্তার দেখাতে। ট্যাক্সি করে। যাবার সময় একবার মাত্র ঘাটে নেমে ঘাটবাবুকে ডাকে: চিকু কোথায়?

চারদিকে চিকু, চিকু রব উঠে যায়।

কয়েক মিনিট বাদে একটা লোক এল খোঁচা খোঁচা একমুখ দাড়ি, একমাথা মোটা মোটা চুল, তেল পড়েনি কত যুগ। গায়ে ধুলো উঠছে, পিঠের কাছে এক ছোপ কাদা শুকিয়ে তামাটে হয়ে গেছে। কাপড় ছেঁড়া। চিমটি কাটলে ময়লা উঠবে। ছোটবাবু অবাক চোখে বলে: চিকু···তোর একি হাল?

শুধু ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকে চিকু। চোখের দু পাশে জট-পাকানো কটা চুলের ঝুরি, কি বীভৎস! কিন্তু কি অসহায়! চিকু কোন উত্তর দেয় না। চিকুর কাছে ছোটবাবু কি প্রশ্ন করছে, এ জানতে বেশ জটলা জুটে যায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে ছোটবাবু বলে: কি…রে চিকু কি হয়েছে তোর?

—কিছু না · আমার কিছু হয়নি তো।

কে একজন বলে: বৌ পালিয়েছে…তাই এই অবস্থা!

—তাতে কি হয়েছে, আবার ফিরে আসবে। আমি ঘুরে আসি, তারপর সব শুনবো। ওদিকে ট্যাক্সিতে বন্দনা বসে আছে, সে যখন শুনলো, এই চিকু, তখন সেও নেমে আসে ট্যাক্সি থেকে। বলে: কি কি হয়েছে তোর? তুই যে আর লক্ষ্মীগঞ্জে যাস্ না? চিকু ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট করে। বাঁ হাতটা মুঠো করে চুলগুলো কামড়ে ধরে …একটা যন্ত্রণা যেন বুকের ভিতর ঘুরপাক খায়।

এই সময় পিছনে একটা কোলাহল ওঠে।

চীৎকার করতে করতে ছুটে আসে এলোকেশী। বলে: —ছোট-বাবু গো · সব্বনাশ হয়েছে…দাদা গিয়েছিল কামালপুরে, সঙ্গে নয়ান বৌ। সেখানে নয়ন বৌ দাদাকে কাটারী দিয়ে খুন করেছে· গো…ও …লো…

ছোটবাবু চীৎকার করে ওঠে: কি হয়েছে?

—ওগো দাদাবাবু গো…নয়ন বৌ আমার দাদাকে খুন করেছে। ডুকরে কেঁদে ওঠে এলোকেশী। কাপড় ও চুল আলুথালু ··

ছোটবাবু অস্ফুটে বলে: নয়ন বৌ ডমরুকে খুন করেছে… ?

—হ্যাঁ গো। ঐ যে! গরুর গাড়ী করে মরা নিয়ে এসেছে—

—এ্যাঁ…ডমরু খুন হয়েছে?

এতক্ষণ চুপ করেছিল চিকু। সবটা শুনতে পায় নি।

—কোথায় ডমরু·· ?

চিকু রাগে ফুঁসছে। হাত দুটো কাঁপছে। আঙুলগুলো ছোট হয়ে আসছে। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। ওদিকে গাড়ীর চারদিকে ভীড়। খুন হয়েছে ডমরু খুন হয়েছে…শব্দগুলো এধার থেকে ওধারে

যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। চিকু একদৌড়ে ভীড় ঠেলে গাড়ীর কাছে ছুটে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে ডমরুর ওপর। ডমরুর কালো পাথরের মত দেহটা খড় বিছানো গাড়ীর ওপর নিথর হয়ে আছে। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ। চোখ দুটো চেয়েই আছে। শাদা চোখের বুকে কালো দুটো পাথরের বল—অস্বচ্ছ, নীরস আর ফ্যাকাসে। কোণ বেয়ে সাদা রস গড়িয়ে পড়েছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। চিকু ডমরুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের লম্বা চুলগুলো দুহাতে খামচে ওকে টেনে তোলে আর পাগলের মত বলে: শয়তান আমার ঘর ভেঙ্গেছিস·· কই? কোথায় নয়না? নয়নাকে কোথায় রেখে এলি? বল্ ··বল্·· নইলে আমি ছাড়বো না···ছাড়বো না। দু একজন চিকুকে ছাড়িয়ে দেয়: ওঃ···আর নেই···চিকু···তোর কথার জবাব দেবার জন্যে, ও থাকলে তো জবাব দেবে···

চিকু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

ছোটবাবু ডাকে: চিকু কি করছিস্··· ?

চিকু উপুড় হয়ে ধুলোতেই বসে পড়ে। ওদিকে এলোকেশীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বন্দনা: তুই চুপ কর এলোকেশী···কি করবি বল··· নিয়তি··· ।

ছোটবাবু একদৃষ্টে ডমরুর দিকে তাকিয়েছিল: এত বড় পাথরের মত শক্ত সবল চেহারা। কে খুন করলে?

—ওগো নয়না খুন করেছে!

এলোকেশী এবারও বলে। হু-হু ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বলে: ওখান থেকে লোক এসেছিল, বলেছে, নয়না ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে খুন করেই পালিয়েছে। ছোটবাবুর খেয়াল হয়: নয়না যখন এসেছিল, তার হাতে কাটারীই ছিল··· ।

বন্দনা বললে: চুপ্ কর এলোকেশী, একটা মেয়েমানুষ সবল পুরুষকে খুন ক'রেছে, কেউ বিশ্বাস করবে না। চুপ কর।

ছোটবাবু বন্দনাকে বললে: চলো ফিরে চলো, মাকে বললেই হবে বর্ধমানে ডাক্তার দেখানো হ'য়েছে। চলো ফিরে যাই··· ।

লক্ষীগঞ্জের দেউড়িতে ট্যাক্সী ঢুকতেই দৌড়ে আসে নয়না।

ছোটবাবু বলে : জানিস নয়না, ডমরু খুন হ'য়েছে। সবাই তোর নাম করছে, কামালপুর থেকে কে লোক এসে বলে গেছে।

—ডমরু মরে গেছে?

নয়না স্তম্ভিত হয়ে যায়। এক মুহূর্ত্ত কথা সরে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বন্দনা জিজ্ঞেস করে :—শোন্ নয়না, তুই নাকি ডমরুকে খুন ক'রেছিস? এ নিয়ে ঘাটে খুব হুলস্থূল পড়ে গেছে। নয়না চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু উচ্চারণ করে ;—ডমরু মরে গেল···?

ছোটবাবু বল্লে : দস্যু লোক, ওদের তো হাল এমনিই হবে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় পুঁটলিটা হাতে নিয়ে ছোটবাবুর কাছে এসে দাঁড়ায় নয়না। বাগান বাড়ীতে বৌদিমণিও ছিল। দুজনে ইজিচেয়ারে ব'সে একটা বই নিয়ে হাসাহাসি করছিল। আলোর মাঝে মাঝে গাছের পাতাগুলো দুলছিল। থেকে থেকে কেঁপে আলোর ঝলক্‌কে ফালি ফালি করছিল। নয়না দাঁড়াতেই ওরা অবাক! কি নয়না···কি ঠিক করলি? ছোটবাবুর কোলে শুয়েছিল বৌদিমণি! নয়নাকে দেখে উঠে পড়ে। নয়না বলে : আমি চললুম।

—কোথায়?

সহজভাবে জবাব দেয় নয়না : চিকুর কাছে···

—তা এই সন্ধ্যেয় কেন?

—নইলে পুলিশে ধরে ফেলবে যে!

—তুই কি সত্যিই খুন করেছিস?

বৌদিমণি জিজ্ঞেস করে। নয়না তেমনি সহজভাবেই বলে : হ্যাঁ—

—সে···কি···? তুই মানুষ খুন করতে পারিস?

বন্দনা আঁৎকে ওঠে।

নয়না পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে। বন্দনার মুখে কোন কথা নেই··· যেন অবশ হ'য়ে গেছে সমস্ত শরীর। সরোজ ওকে কোলে তুলে নেয় : বন্দনা ··বন্দনা ··এই···কি হ'ল?

* * *

ডমরুর দেহটা পোষ্টমর্টম করার জন্য সদর থানায় নিয়ে গেছে। সন্ধ্যের সময় সমস্ত ঘাটটা যেন খাঁ খাঁ করছে। একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি যেন

সবাইকে তছ্‌নছ্‌ ক'রে দিয়ে গেছে। ঘাটবাবু একা ব'সে আছে, পাশে হাজাকের আলো। খানিকটা জায়গায় উজ্জ্বল চকচকে, বাকী সারা ঘাট, নদীর চর, তীরভূমি, পীর পালামের থান—সব—সব যেন একটা অন্ধকারের পলেস্তরায় ঢাকা পড়েছে। মাঝিদের মনে কোন আনন্দ নেই, গানের কোন কলি আজ ফুক্‌রে ওঠে না। মন মাঝি আজ্ঞ মরে গেছে। মনে হচ্ছে কতকগুলো প্রেত যেন যন্ত্রচালিতের মত শুধু লগি ঠেলছে, নৌকোটাও যেন ভূতের মত ছপ্‌ছপ্‌ করতে করতে এধার ওধার করছে। আর ঘাটের টিকিট আদায়ের টিকিটবাবুও যেন তিন পুরুষ আগে মরে বাসি হ'য়ে গেছে। এমনই ফ্যাকাশে, এমনই বিবর্ণ।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যেও কোন কথা নেই। শুধু দুটি কথা খেলনা ফুটবলের মত ড্রপ খাচ্ছে—খুন, ডমরু। ডমরু—খুন।

নয়নতারা এক্সপ্রেস আর চলে না? ও নৌকো আর কেউ বায় না। তেল সিঁদুর দিয়ে আবু দিন কতক পূজো ক'রেছিল। লেখাটায় সিঁদুর দিয়েছিল মুছেছিল। কিন্তু আর কেউ দেয়নি। সিঁদুরের দাগে দাগে হাত বুলিয়ে দেখে চিকু। সেদিন কুড়ুলে ক'রে চেলা দিয়েছিল। সেখানটা আবু নূতন কাঠ দিয়ে সেরে দিয়েছিল। সেখানটায় হাত পড়তেই চিকুর বুকটা টনটন্‌ ক'রে ওঠে। চিকু তার চেয়ে নিজের বুকেই কুড়ুল মারেনি কেনে? এর দোষ কি? মাথা খুঁড়তে থাকে চিকু। মুখ থুবড়ে নয়নতারা এক্সপ্রেস পড়ে আছে। চিকুর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো। চিকু কাঁদছে। নয়নতারা এক্সপ্রেসও কাঁদছে না কি? হাত বুলোতে বুলোতে চিকুর মাথায় যন্ত্রণা আরম্ভ হ'লো। মাথা টিপে নৌকোতেই আড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে চিকু।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। একজন ওকে লাঠি দিয়ে ঠেলা দিতেই বুঝতে পারে। ওরা কারা? কজন পুলিশ। ওর হাতে হাত-কড়া পরাতেই চিকু প্রশ্ন করে: কেনে? আমি কি করেছি?

—কি করেছিস্‌ থানায় গিয়ে জবাব পাবি।

—বাঃ আমার নয়নাকে ফুসলিয়ে লিয়ে গেল, আমার ঘর ভেঙ্গে গেল, আর আমার হাতেই হাতকড়া? বিচার বটে?

একজন পুলিশ রুলের গুঁতো দিয়ে ধমক দেয়: এ্যাই-অ, বেশি ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করবি তো ঝোল-ভাত খাইয়ে দোব। নয়না কোথায়?

চিকু বলে : আমারও তো একই কথা, নয়না কোথায় ?

—ডমরুকে খুন ক'রে পালিয়েছে।

—মিথ্যে কথা। সে ডমরুকে খুন করতে পারে না, অন্য কেউ করেছে।

চিকুকে দড়ি ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাচ্ছে। চিকু চিৎকার করছে : আমায় ছেড়ে দাও···আজ নয়না আসবে। আজ সে আসবেই, আমার ঘরে সে ফিরে আসবে। আমি না থাকলে তার কি অবস্থা হবে ?

—তুই কেমন ক'রে জানলি সে আসবে ?

—হ্যাঁ, আমার মন বলছে। সে আসবেই, আমি যে তাকে একবার দুটো কথা বলতে চাই।

—চল্, চল্, জেলে ব'সে খুব কথা কইবি। তাকেও জেলেই পাবি।

বেশী রাতে নয়না পলেমপুরের বাঁশবাগানে ঢুকলো। শুকনো বাঁশপাতার মচ্‌মচানি শব্দে তারই মনে কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। রাতচড়া পাখীটা বিকট চিৎকার ক'রে ওঠে। আকাশের উজ্জ্বল চাঁদের আলো বাঁশবাগানের চাঁদোয়া ভেদ ক'রে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে। নয়না কুঁড়েতে ফিরে দেখে ঘর খোলা হাঁ হাঁ করছে। একটা নেড়ি কুকুর মুখে জিভ বুলোতে বুলোতে কেঁউ কেঁউ ক'রে চলে যায়। চৌকাঠে পা দিয়ে একটু থমকে দাঁড়ায় নয়না। মনে হয় কে যেন পিছনে পিছনে তাকে অনুসরণ করছে।

ছেঁচা বাঁশের কুঁড়ে। শিকল খুলে ঘরের ভিতর ঢোকে। কতদিন ঝাঁট পড়েনি। মাকড়সার জালে ঘর ভর্তি। অন্ধকারে তার চোখেমুখে জালের লালা লেগে র'য়েছে। চামচিকে ও বাদুড় ঝটপট্ করতে করতে বেরিয়ে যায়। বাঁশের বাখারির রেলিং দেওয়া জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় নয়না। দামোদরের বুক থেকে অজস্র ছোট্ট ঢেউয়ের আদর খেয়ে টুকরো টুকরো বালি আর কাশফুলগুলোকে আত্মহারা ক'রে হিমেল বায়ু এসে নয়নাকে আদর করে। ওর দেহের তাপ নিতে মাতাল বায়ু দেহের সর্বত্র শিহরণ ছড়িয়ে দেয়।

পিছন থেকে একটা টর্চের ফোকাস নয়নার গায়ের ওপর পড়ে।

আর খানিকটা আলো কোন প্রতিবন্ধক না পেয়ে সামনের জানালায় পড়ে।

নয়না চমকে ওঠে : কে··· ?

—তোকেই খুঁজছি ! খুঁজে হয়রান। শেষকালে যে এখানে পাওয়া যাবে ভাবতে পারিনি। নয়না দেখে সামনে পুলিশ।

নয়না এতটুকু ভয় খায় না। বলে : কিন্তু চিকুকে ছেড়ে দাও···সে বেচারা নির্দোষ···। খুন আমি করিছি, শাস্তি আমাকে দিক···

অবশ্য পরের দিনই চিকুকে ছেড়ে দিয়েছিল।

চিকু জেলেতেই শুনলো, খুনী আসামী নয়না ধরা পড়েছে। উবু হয়ে ফাটকে বসে চিকু মেঝেতে আঁচড় কাটছে, বোধ হয় ভাগ্যের একটা হিসেব নিকেশ করছে। নয়না ধরা পড়েছে কানে যেতেই চকিতে খাড়া হয়ে ওঠে। বলে : কি ? নয়না ধরা পড়েছে। নয়না তাহলে বেঁচে আছে ?

যখন চিকুকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন সে জেলের ওয়ার্ডারদের জিজ্ঞেস করে : যে মেয়েটাকে কাল ধরে এনেছে, সে কোথায় ?

ওয়ার্ডারদের একটু কাকুতি মিনতি করে নয়নার রেলিং-এর সামনে আসতে পায় চিকু। দূরে এককোণে একটা ময়লা বিছানার ওপর নয়না উবুড় হয়ে পড়ে। এধারে চিকু দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা, পাগলপ্রায়। চিকু একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হয়ত ভাবছিল, জীবনের গতিপ্রকৃতির এক বিশেষ পর্যায়ে এসে তারা যেন আটকে গেছে। একটা বিরাট দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতার নাগপাশে জড়িয়ে রয়েছে তাদের কামনা, বাসনা, চিরন্তন ভাবনা। তাদের দাম্পত্যজীবনের চলার পথে আজ যেন সুধার অমৃত ভাণ্ডটিকে কে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে।

একসময় নয়না দেখতে পায় চিকুকে। আশ্চর্য ও অবাক চোখে তাকায় ও। আস্তে আস্তে চিকুর দৃশ্যপট থেকে দূরে সরে যায় নয়না।

ছোটবাবু মানে সরোজ তোলপাড় করে তোলে। পলেমপুর, কামালপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ থেকে সে সাক্ষী সাবুদ জোগাড় করে। থানার ঘরে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানে। উকিলবাবুকে নিয়ে যায়।

খেঁদি বলে ভাবনা নেই বাবু, আমি সাক্ষী দোব আমি বলবো ডমরু ওকে টেনে এনেছিল, ডমরুর হাত থেকে বাঁচবার লেগেই কাটারী নিয়ে…

সরোজ খুব খাটলো। টাকা খরচ ক'রে মামলা চালালো। ক'লকাতা থেকে বড় ব্যারিষ্টার আনলো। অনেকেই সাক্ষী দেয়, সরকারের সাক্ষী কেবল এলোকেশী…।

একদিন ছোটবাবু এলোকেশীকে ডাকায়। বলে:

—এলোকেশী, ডমরু চলে গেছে এটা খুবই দুঃখের। একটা উত্তেজনার মাথায় নয়না একাজ ক'রেছে। কিন্তু তার জন্যে চিকুর ঘরটাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে তোর কি লাভ হবে?

একটু থেমে ছোটবাবু বলে: দেখ, মেয়েটা বিয়ে হ'য়ে থেকে তার স্বামীকে পেল না, চিকুও খ্যাপা পাগলের মত হ'য়ে গেছে। শুনেছি, তুই চিকুকে ভালবাসিস। কিন্তু তার ওপর প্রতিশোধ নিলে কি ভালবাসার আর কোন চিহ্ন থাকবে?

এলোকেশী ঘাড় হেঁট ক'রে বলে: আমায় কি করতে বলেন বাবু?

—তোকে উল্টো সাক্ষী দিতে হবে। তোকে বলতে হবে, হ্যাঁ দাদা নয়নাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আর তুই তোর দাদাকে সাহায্য করেছিলি।

একমুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে এলোকেশী বলে: আমায় একটু ভাবতে সময় দিন বাবুজী।

আষাঢ় মাস। এবার বর্ষা দেরীতে আসবে। তাই আষাঢ়ের মাঝামাঝিতেও নদী এক চিলতে নালা হ'য়ে র'য়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চিকু নদীর গর্ভে এসে দাঁড়ায়। দূরে নয়নতারা এক্সপ্রেস মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওখানটায় থকথকে কাদা আর জল। জ্যোৎস্নার আলোয় মনে হচ্ছে যেন মুখের কষ বেয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে। নয়নার সেই লেখাটা আর ঠাহর হয় না। জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজে চিকু। একটা বিদ্যুৎ চমকাতেই পুরানো সিঁদুরের দাগটা চিকুর চোখে উজ্জ্বল হ'য়ে ধরা পড়ে। চিকু সেখানটায় হাত দিয়ে হু হু

করে কাঁদে। কড়কড়িয়ে মেঘ ডাকছে, রিমি ঝিমি করে বৃষ্টি নামে। কিন্তু চিকু নির্বিকার। জোরে…আরও জোরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসে। চিকু মুখ গুঁজে নৌকোর পাশে উবুড় হ'য়ে পড়ে। কল্ কল্ ক'রে জল ওর সারা গা ধুয়ে নদীতে মিশে যেতে থাকে।

পরের দিন ছোটবাবুই ওকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে আসে। জলে ভিজে পুরানো টাইফয়েডটা আবার জানানি দেয়। অচৈতন্য বেহুঁস হ'য়ে দু দিন পড়ে থাকার পর জ্ঞান ফিরলো। হাসপাতালে যমে-ডাক্তারে লড়াই চললো চিকুকে নিয়ে। ছোটবাবু খুব করলো। চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেনি। ওষুধ-ডাক্তারেরও না।

অসুখের মাঝেই নার্সদের সরিয়ে দিল একটি মেয়ে এসে। বললো—তোমাদের কাজ নয়। ও সেবাতে ওর কিছু হবে না…তোমরা সরে যাও।

ডাক্তার প্রথমে আপত্তি ক'রেছিল। কিন্তু যখন দেখলো গরম জলের ন্যাকড়া ডুবিয়ে মেয়েটি অতি যত্নে চিকুর মুখের কোণ, চোখ, পায়ের পাতা মুছিয়ে দিচ্ছে, আদর ক'রে অচৈতন্য মাথাটা কোলে তুলে নেয়। গরম কম্বলের ভাপ দিচ্ছে বুকে, গলায়—এ যেন একটি সাক্ষাৎ মাতৃ-মূর্তি! ডাক্তার একজন নার্সকে লক্ষ্য রাখতে বলে ওর হাতেই ছেড়ে দিয়ে বলে—লিভ হিম টু হার।

সকলকে অবাক ক'রে দিয়েছিল ঐ মেয়েটা। বেশ কয়েকদিন বাদে জ্ঞান ফিরলো চিকুর। চোখ মেলে চাইতেই নজরে পড়ে, কার কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে র'য়েছে? এই মেয়েটি কি তার চেনা? চিকু দেখছে একমাথা কালো এলো করা চুল, সাদা লাল পাড় শাড়ি, কপালে বড় একটা সিঁদুরের টিপ। মুখের ডৌলটা ডাবের আভা নিয়ে টাটকা হ'য়ে র'য়েছে। কে এ - তাকে চিনতে পারবে কি ক'রে? ওর চার-দিকে যেন একটা সাদা তুষারের পর্দা দেওয়া র'য়েছে। হ্যাঁ রোদ উঠ্-তেই তুষার গল্ছে…গল্তে গল্তে আসল মূর্তি বের হ'য়ে আসছে। কি আশ্চর্য্য তার চোখের সামনে থেকে পর্দাটা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এবার চিনতে পেরেছে…

একবার চোখ বুজে ,চাইতেই যেন ডুবুরি মুক্তো তুলেছে। অস্ফুটে আঠালো ঠোঁটে বলে—নয়না…

—উঁ…। নয়না অজান্তে সাড়া দিয়েছে। ও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চিকুর চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে! নয়না আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয়। ওর চোখেও যে জল।

—কি চেহারা হ'য়েছে তোমার ?

নয়না ফুঁপিয়ে ওঠে। নয়নার চোখের স্বচ্ছ আলোয় চিকুর মুখটা ধরা পড়ে। এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর জটপাকানো কটা চুল সমস্ত মুখটাকে ঢেকে রেখেছে। চোখ দুটো বসে গেছে, গালের হাড় উঁচু হ'য়ে কী বীভৎস চেহারা হ'য়েছে।

তোর যে হাজত হয়েছিল ? কবে ছাড়া পেলি ?

—কাল। মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছি। ছোটবাবুই কাল এখেনে আমাকে সোজা হাজত থেকে নিয়ে এলো।

চিকুর চোখে এসে পড়েছে নয়নার চুলের গোছা। আস্তে আস্তে নয়না কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে নেয়, চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

—নয়না। তুই তাহলে সত্যিই এলি—? চিকুর চোখের পাতা দুটো ডুবুডুবু তারার ওপর যেন ডিঙ্গির মত ভেসে উঠলো। চারদিকে জল গড়িয়ে পড়ে। চিকু অঝোরে কাঁদছে। নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে নয়না—গায়ে, মাথায়, কপালে, চোখে, মুখে…।

—আঃ কি আরাম। তোর হাতটা কি মিষ্টি! নয়নার হাত দুটো নিজের হাত দিয়ে কপালের ওপর টিপে ধরে।—তুই আবার এলি · ?

—না এসে থাকতে পারি নে যে!

—আমি জানতুম। সে কথাই এলোকেশীকে বলেছি। চিকুকে আর কথা বলতে দেয়নি নয়না। নিজেই ব'লেছে, চিকু শুধু কেঁদেছে আর শুনেছে। কেমন করে নয়না ডমরুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। রাতে নৌকোতেও ডমরু তাকে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু কেমন যেন মন চায়নি। কামালপুরে লটবরের বাপের অসহায় অবস্থা, খেঁদির লুকোচুরি, ডমরুর

ব্যাভিচার...সব ··সব বলতে বলতে নয়না উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—ডমরু একটা দস্যি, সে রাতে আমাকে নষ্ট করতে চেয়েছিল, আমি বাঁচবার জন্যে কাটারী বসিয়েছি। কত মেয়েকে এভাবে ও সব্বনাশ করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ডমরুর জন্যে মায়া হয় না, মায়া হয় দিদির জন্যে, খেঁদির জন্যে। এবার সুখে ঘরকন্না করবে। লটবর, বিন্দি, কিষ্টো ··এদের নিয়ে সুখের সংসার···।

সে রাতেই ছুটে এসেছিল ছোটবাবুর কাছে। ছোটবাবু তাকে লক্ষ্মীগঞ্জে বৌদিমণির কাছে নিয়ে যায়।

চিকু চোখ বুজে উত্তর দেয়—বৌদিমণির কাছ থেকে পাঠ নিতে ?

—হ্যাঁ, তা যা বলবে ! বৌদিমণি কি সোন্দর। সাদা ধবধবে রঙ, চোখে চশমা, কি চেহারা, যৌবন যেন ধরে রাখতে পারছে না। আর কি হাসিখুশি মেয়ে। ছোটবাবু আর বৌদিমণি—দুজনে যা ঝুটোপুটি করে, লোভ লাগে।

একদিন বাদেই চিকুকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেয়।

পালেমপুরে চিকু আর নয়না ফিরে এসেছে, এ সংবাদে গাঁ টি টি। ওদের দেখবার জন্যে গাঁ ভেঙ্গে লোক জড়ো হয়। যেদিন চিকুকে ধরে নিয়ে যায় সেদিন ছিল মরা দামোদর, মরা মানুষের ছায়া, একটা বিষাদ-খিন্ন আবহাওয়া। এক পাল কান্না সেদিন প্রেতলোক থেকে যেন লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিল। আর আজ ভরা দামোদর। দুকুল ছাপিয়ে তীর ভাঙ্গা ঢেউ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে, রাগে উত্তেজনায় উত্তপ্ত নিঃশ্বাস নিয়ে ফুঁসে উঠছে হাজার—লক্ষ অজগরের ক্রোধ নিয়ে।

নদীর তীরে নয়নতারা এক্সপ্রেস মুখ গুঁজে পড়ে আছে। কেউ আর তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। বানে ভেসে যাবে বলে তাকে তুলে এনে রেখেছে। কোনও মাঝি সে নৌকো নেয় নি। সবাই বলেছে চিকু এসে লগি ধরবে। বলেছে - চিকু, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ, তোর নয়নতারা এক্সপ্রেসকে কেউ ছুঁয়ে বেইজ্জত করে নি। করতে দিই নি। চিকু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। চোখের পাতা নামিয়ে কি যেন ভাবে।

সেই একদিনই মাত্র রোগ থেকে উঠে বাইরে গিয়েছিল চিকু। নয়না জানলা দিয়ে দেখছিল, কখন ফিরে আসে। হঠাৎ দেখলো ছুটে আস্‌ছে চিকু।

—কি হ'লো ছুটছ কেনে ?

—আমাকে বেছানা করে দে। আবার কাঁপুনি লেগেছে।

—কি হলো ওখানে অত আগুন কেনে ? নয়না জানলা দিয়ে দেখে। বুকটা ধড়ফড় করে।

—ওখেনে দাঁড়াস নে। চলে আয়। বলে চিকু ওকে বুকে টেনে নিয়ে আসে। এই প্রথম এত গভীরভাবে নয়নাকে ও আদর করে যে নয়নার মনে হলো ও স্বর্গে যাচ্ছে। সোনার রথে চড়ে, দিক-দিগন্ত ভেদ করে ঊর্ধ্বলোকে…আনন্দলোকে।

—কি হয়েছে তোমার, কাঁপছ কেন ?

—কিচ্ছু না। লেপ চাপা দে।

চিকু শুয়ে পড়ে, নয়না কাঁদ কাঁদ হ'য়ে মাথার কাছে বসে। নয়নার মাথাটা চিকু বুকে চেপে ধরে আদর করে। ওদিকে কিসের যেন একটা আগুনের হল্‌কা উঠ্‌ছে, ক্রমেই ওপরে উঠ্‌ছে। ফট্‌ ফটাফট্‌ আওয়াজ আওয়াজ হচ্ছে। খুব চিৎকার আগুন জল জল পুড়ে গেল…পুড়ে গেল। আগুনের আঁচ সারা গ্রামকে রাঙিয়ে দিয়ে দিয়েছে, সে রঙের ছোঁয়া চিকুর ছেঁচা বাঁশের কুঁড়ের জানালা ভেদ ক'রে ঘরে এসে ঢোকে। চিকু আর নয়নাকেও গভীরভাবে রাঙিয়ে দেয়।

বিচিত্র এই দামোদর। বিচিত্র এই মাঝিদের জীবন। এমন একদিন ছিল দামোদরের প্রচণ্ড বন্যায় এদের আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ী ভেসে যেত। আজ এরা সেই দামোদরকে দেখছে মরা, শান্ত, সংযত, মন্ত্রপূত সরীসৃপের মত। কিন্তু কখনও কখনও বাগ পেলেই সে ফুলে ওঠে, সংহার মূর্তি ধরে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে মাঝিদের জীবনও সমান্তরাল ভাবে চলে। তীর ভাঙ্গা ঢেউ আর চর জাগা টানের সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্যেও এদের ঘর-সংসার, প্রেম-প্রণয়, কাম-ব্যভিচার, প্রতিহিংসা জিঘাংসার কীটগুলো কিলবিল ক'রে মোটা আঁচড়ের দাগ টানে।

তা নিয়ে একটু কোলাহল, একটু মজলিস। পরে যেন লেখা শ্লেটের ওপর নেতি বুলিয়ে মুছে দেওয়ার মত সব পরিষ্কার। সব সহজ, সরল, অথচ উদ্দাম।

পরদিন ঘাটবাবুর কাছে চিকু জোড় হাত ক'রে দাঁড়ায়। ঘাটবাবু হেঁকে ওঠে—ওরে চিকু কাজ করতে এসেছে—চিকু এসেছে…

ঘাটবাবু দুঃখ করে—হাজার চেষ্টা করেও তোর লৌকোকে বাঁচাতে পারিনি। কি ক'রে যে আগুন লাগলো। কোন শালা যে এ সব্বনাশ করলে। একজন বললো—ছোটবাবু ব'লেছে লয়নতারা এক্সপেস লতুন করিয়ে দেবে।

ঘাটবাবু বলে—সে ভাবনা নেই চিকু, আমি দাঁড়িয়ে থেকে নয়নতারা এক্সপ্রেস করিয়ে দেবো। নতুন হবে। পাশেই নয়নতারা এক্সপ্রেসের পোড়া দেহটা কালো বিবর্ণ হ'য়ে ফসিল হ'য়ে র'য়েছে যেন।

চিকু সেদিকে না তাকিয়ে বলে—বাবু আমি আর লৌকো বাইবো নি।



হত্যা

ঠিক শিং এর গোড়াতেই কোপটা এসে পড়লো। এক ঝলক রক্ত তীরের ফলার মত ছুটে গিয়ে চোখে মুখে, কপালে লাগলো। মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখলো কেষ্ট। বাঁ হাতে রক্তটা মুছে নিয়ে ঝাপ্সা চোখে তাকালো কেষ্ট।

—শালা কি কর্লি? কি কর্লি? চেঁচিয়ে উঠ্লো সবাই। পুজারী ঠাকুর হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্লো। অমঙ্গল—অকল্যাণ—কেষ্ট চোখ বন্ধ করে আর এক কোপ। এত জোরে যে দা'টা মাটিতে বসে গেছে।

সবাই চিৎকার করে উঠ্লো, ত্থু' চোট, ত্থু' চোট, হ'য়ে গেছে। পাঁঠা ত্থু' চোট হ'য়ে গেছে।

মেয়ে মহলে হাউ—চাউ স্নুরু হয়ে গেছে।

কেষ্ট হ্যাজাকের আলোয় এতক্ষণে চোখমেলে তাকালো। যেন কালী বাড়ীর চারদিকে একটা ধোঁয়াটে কুয়াশা। আর বহু দূর থেকে কার আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে। হ্যাজাকের আলো থেকে বর্শার ফলকের মত রশ্মিগুলো কেষ্টর চোখে পড়ছে। লাল চোখে কেষ্ট তাকালো, দা'টা এখনো মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। পাঁঠার মুণ্ডুটা ত্থটো কোপ খেয়েছে। একটা কোপ দাগ্ড়া হ'য়ে র'য়েছে। লাল তাজা রক্তে হাঁ-টা ভর্তি হয়ে গেছে। ত্থটো শিং এর মাঝখানে এই কোপটা প'ড়েছিল। রক্ত ঝুজিয়ে পড়ছে। আর শেষের কোপটা অনেকটা দূরে ঘাড়ে পড়েছে। এই কোপটাই মুণ্ডুটাকে দেহ থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

নিশানা ঠিকই করেছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে গেল

কেষ্টর। হাতটা কেঁপে উঠ্‌লো। আর এই সময় পাঁঠাটা জিভ বার করে একবার ম্যা' করে উঠলো। মাতালের মত টলে উঠলো। চেয়ে দেখলো, পাঁঠাটার চোখ থকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

—এ কেষ্টা! কেষ্টা! কি হল তোর?

—মদ মেরেছে, আবার কি হবে?

অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়ালো কেষ্ট। পূজামণ্ডপ ছেড়ে বাইরে, পা দুটো চল্‌ছে না, কে যেন টেনে ধরে রাখ্‌ছে। এখনও কিছু ভাব্‌তে পারছে না ও! কেন এমন হ'ল?

যখন পাঁঠাটাকে জলে ডুবিয়ে আনতে গিয়েছিল তখন থেকেই কেষ্টর বুকটা যেন কেমন ধড়ফড় করছিল। কালো কুচকুচে পাঁঠাটা একবার আদর করে তার ডান হাতটা চেটেছিল। হ্যাজাক আলোর ভয়ে এক লাফে ওর কোলের উপর এসে পড়েছিল। কেষ্ট কোলে করে নিয়ে পুজারী ঠাকুরকে বলেছিল, চলেন কেনে, ডুবিয়ে নিয়ে আসি। জলে ছেড়ে দিতেই সেকি চিৎকার। ম্যা—ম্যা—করতে করতে কেষ্টর পায়ের কাছে হুড়মুড়িয়ে পড়লো।

পুজারী ঠাকুর মাথায় সিন্দুর আর যবদূর্বা দিয়ে দিল। সিন্দুর লাগানো আম পাতাটা পূজারী ঠাকুরের হাত থেকে একরকম চুরি করেই ও খেয়ে নিল।

কেষ্টর যেন কেমন মায়া হল। বললে, ঠাকুর, পাঁঠা বলি বন্ধ করে দিলে হয় না?

ঠাকুর নাক থেকে কপালে তখন সিন্দুর দিয়ে তিলোক কাটছিলো। কটমট করে ওর দিকে তাকালো। মুখে কি যেন গোটা কতক মন্ত্র উচ্চারণ করলো ঠাকুরমশাই। তারপর বললে, পাপ হবে। বুঝলি কিষ্টো? একথা উচ্চারণ করলি, শাস্তি পাবি একদিন।

বামুন ঠাকুরের ধমক খেয়ে ভড়কে গেল কেষ্ট। বুকের ভেতরটা গুর্ গুর্ করে উঠ্‌লো।

এর আগে বহু পাঁঠাই তো তার হাতে দু' আধখানা হয়েছে, কই এমন তো হয়নি। এমন মাতালের মত ভয় জড়ানো দ্বিধাগ্রস্ত হাত, এমন ঝাপ্‌সা

চোখ, কেষ্টর আজ কি হল ?

দামোদরের জলে এসে নামলো।

হাতটা ভাল করে ধুয়ে নিলে। চোখে, মুখে ও কপালে আঠার মত চটচটে কালো রক্তটা জমাট বেঁধে আছে। জলের ঝাপট দিয়ে ধুতে লাগলো।

মনে পড়ছে তার। সেই প্রথম দিনের কথা। কেষ্টর বাপ, ঠাকুরদা চিরকাল এই পাঁঠা বলি ক'রেছে। উত্তরাধিকারী সূত্রে কাজটা ওকেই করতে হলো। পূজারী ঠাকুর বিশ বছরের জোয়ান কেষ্টকে স্নান সেরে আসতে বললো। উপোস করতে বলল। মায়ের সামনে আসতেই কেষ্টর গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করলো। সেদিন ওর কি রোমাঞ্চ!

কালো কুচকুচে দেহ। পেশীর ভাঁজে ভাঁজে উন্মাদনা ফুটে বেরুচ্ছে। বিশ বছরের এক জোয়ান যেন মন্ত্র পেয়ে বিশ জনের বল পেয়েছে মুহূর্ত্তে। মন্ত্র পড়তে পড়তেই পুরুত ঠাকুর হেতেরটা তার হাতে গুঁজে দিলো সিন্দুর মাখিয়ে।

কেষ্ট যেন রাজা। একবার মা কালীর দিকে তাকালো। লাল জিভটা লক লক করছে। কেষ্টর যেন মনে হ'ল, কত যুগ ধরে মা কালী ঠিক এমনি করে রক্ত চুষেছে। তার বাবা, ঠাকুরদা ঠিক এমনি করে পাঁঠা কেটেছে, আর মা সেই রক্ত আকণ্ঠ পান করেছে। যেন একটা নেশা ধরে গেল। কেষ্টর মুখে রা নেই। ও যেন এক স্বতন্ত্র জীব। যারা হাড়িকাঠে পাঁঠার মাথাটা গুঁজে দিচ্ছিল, তাদের দিকে ও আর ভ্রূক্ষেপ করে না। কেষ্টকে ডেকে যেন সাড়া পাওয়া যায় না। সে যেন অন্য জগতের মানুষ।

কেষ্ট—কেষ্ট দেখিস্ হেতেরটা ভাল করে ধরিস। পুজারী ঠাকুর সাবধান করে দিল, আর কেষ্টকে কেউ কিছু বলবে না।

সত্যি কেষ্ট যেন কেমন হ'য়ে গেল। চোখ দুটো মুহূর্ত্তে লাল হয়ে গেল। পাঁঠাটাকে শক্ত করে ধরেছে—পা দুটো টেনে। জয়—মো—চিৎকার উঠেছে। বাজনা বাজাবার জন্য ঢাকীরা তৈরী।

জিভ বার করে ম্যা করে উঠলো পাঁঠাটা। কেষ্টর লোম খাড়া হয়ে উঠলো। সে যেন সত্যি দেখতে পাচ্ছে, একটা বিকট মুখব্যাদন করে লেলিহান জিহ্বা

মেলে তার সামনে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উন্মত্তের মত কেষ্টর দাটা একবার উঁচুতে উঠে সজোরে নেমে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ও বাজনা।

বাব্। আর কিছু মনে নেই। হেত্তেরটা হাতে ধরেই কেষ্ট উপুর হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো। সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। কিন্তু পূজারী ঠাকুর সাবধান করে দিলে, চেঁচাবেন না সব, ভড় হয়েছে। মা-এর কাছে প্রথম বলি দিল কিনা? তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

সত্যিই তাই। আধ ঘন্টার মধ্যে কেষ্ট উঠে বসেছিলো। ধীরে ধীরে উঠে এই দামোদরের ঘাটেই এসেছিল। মনে হয়েছিল শরীরটাকে যেন ছোবড়ার মত দলা পাকিয়ে শক্ত করে দিয়েছে। গা-হাতে প্রচণ্ড ব্যথা। আধঘন্টা ধরে দামোদরের জলে গা ডুবিয়ে ছিল ও। ভিজে কাপড়ে ভিজে গায়ে ঘরে এসেছিল।

সে দিনের কথা মনে পড়লে কেমন যেন ভয় হয়।

শিউলি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে। নতুন বিয়ে করা বৌ। বয়সের তফাৎ অনেক। কেষ্ট বলে:

: অমন হাঁ ক'রে কি দেখছিস? একটা শুকনো কাপড় দিবি নেকি?

যেন সম্বিত ফিরে আসে শিউলির। তাড়াতাড়ি কাপড় বের ক'রে দেয়। কেষ্টর মা বাবা এখনও মায়ের থানে। ঘরে আসে নি। কেষ্ট কাপড় পড়তে পড়তে বলে:

: শিউলি এক কাপ গরম চা কর দিকিনি। শালার হ্যাজাক আলোর ছামুতে চোখ দুটো যেন ধুতরো ফুল। শিউলি চা গরম করছে। আড় চোখে কেষ্টকে দেখছে। তার মুখটায় লাল আগুনে আলতার রঙ। কেষ্ট হো হো ক'রে হেসে ব'লে: শিউলি তুই খুব ভড়কে গেছিস লয়? চা নিয়ে আসতেই যোয়ান কেষ্ট পাঁজকোলা ক'রে শিউলিকে দুহাতে শূন্যে তুলে পুতুলের মত লোফালুফি করতে থাকে। এতক্ষণে শিউলির মুখ দিয়ে কথা ফুটলো: হাসি লয়, আমার যা ভয় হইছিল—আমি বাবু পাঁঠা বলি আর দেখবোনি।

: ধুস্, ভয় কি?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কেষ্ট বলে: আমার বাপ ঠাকুরদার পেশা,

আমি ছেড়ে দিলে পাপ হবে না ?

অবাক চোখে শিউলি তাকায় পাপ হ'বে ? সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। আ-হা অবলা জীবকে হত্যা ক'রে কিসের পুণ্য, কিসের আশায়। কিন্তু একটা কথাও বলতে পারে না। সব কথা যে জমাট বেঁধে ঘনীভূত হ'য়ে গেছে।

বলির পাওনা শুধু মুড়িটা।

তাই নিশানা ক'রে কোপটা ধড় ঘেঁষে ফেলতে হয়। যাতে মুড়িতে ঘাড়ের মাংসটা ও পাওয়া যায়। প্রথম ঠকতে হয়েছে। কিন্তু তাক ক'রে কোপ ফেলা অভ্যাস করতেই লাভের অংক বেশি পেয়েছে কেষ্ট। বলির তারিফ করেছে অনেকেই। আজও সে ধড় ঘেঁসে ফেলতে গিয়েই মাতালের মত টাল সামলাতে না পেরে শিং-এর গোড়াতেই ফেলেছিল। মাতাল অবশ্য হয়নি কেষ্ট। পূজারী ঠাকুরের এক চামচ 'চন্নামেত্তর' খেয়ে কি মাতাল হওয়া যায় ?

শিউলী অবশ্য বারণ করেছিল কেষ্টকে।

: দরকার নেই বাপু মুড়ির। তুমি ও পাঁঠা কাটা ছেড়ে দাও।

ধমকে উঠেছিল কেষ্ট : বলিস না ও কথা। জানিস জলজ্যান্ত জাগ্রত দেবতা। কি হ'তে কি হয়ে যাবে।

: আমার বাপু ভয় লাগে।

: ভয় কি ? পাঁঠা কি আমি কাটি ? আমি তো হেতেরটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, মা'-ই তো জোর করে হাতটা নামিয়ে দেয়।

শিউলী এখানে এসে সেই প্রথম একদিন দেখার পর আর পাঁঠা বলি দেখতো না। কিন্তু এখন সব সহ্য হ'য়ে গেছে।

কেষ্ট নদীর জল থেকে উঠলো।

অমাবস্যার ঘন অন্ধকার। সমস্ত পৃথিবীকে যেন একটা কালো পুরু পর্দায় কে মুড়ে রেখেছে। যেন একটা দস্যুর হাতের মুঠোয় এই মুহূর্তে এতবড় পৃথিবীটা একটা কালো বিন্দুর মত ছোট হয়ে গেছে।

: কে ?

দামোদরের ঘাটেই কে যেন দাঁড়িয়ে।

: চল। ঘরে চল।

শিউলী কালী বাড়ীর ভীড় ছেড়ে কেষ্টর পিছু পিছু এসেছে।

এমনটা অনেক দিন হয়নি। আজ আবার সেই আগের মত উদ্-ভ্রান্ত ভাব।

শিউলী পিছনে, কেষ্ট আগে আগে চলেছে।

: তুমি ছেড়ে দাও। কে পাঁঠা কাটবে ওরা দেখে নিক। কি দরকার বাপু, জানোয়ার হত্যায় কাজ নেই।

কেষ্ট একটিও কথা বলেনি।

দাওয়ায় খড়ের বিঁড়ের উপর ঝিমিয়ে রয়েছে কেষ্ট। একটু দূরেই শিউলী খোয়া জ্বালিয়ে চা করছে। একটু গরম কিছু না দিলে 'জ্ঞান' ফিরবে না।

: নাও চা'টা খেয়ে নাও।

ঘোলাটে চোখে কেষ্ট তাকালো। উনোনের আঁচে শিউলীর মুখটা দেখা যাচ্ছে। ভয় থমথমে মুখটা আগুনের আঁচে লালচে ছোপ ধরেছে। সাপের মত এঁকে বেঁকে দু' একটা চুল কপাল বেয়ে গালে এসে পড়েছে।

: শুনছ ?

: উঁ—। যেন অনেক দূর থেকে একটা অর্ধ অচেতন জড় পদার্থ মুহূর্ত্তে প্রাণ পেয়ে ক্ষীণস্বরে সাড়া দিল।

: ছেড়ে দাও। পাঁঠা কাটতে হবে না তোমাকে। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

: একটা মাদুর পেতে দে।

জড় পদার্থের মত কেষ্ট আড়মুড়ি হয়ে শুয়ে পড়লো। একটা অচৈতন্য ভাব এখনো তাকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। যেন একজন যাদুকর তার দণ্ডটি দিয়ে সারা গায়ে ছোঁয়া দিয়ে দিয়েছে। তার ফলে দেহটা অচেতন—জড় পদার্থ।

: সেঁক তাপ দেবো ?

গায়ে হাত দিয়ে শিউলী কেঁপে উঠলো।

: ওমা, কি ঠাণ্ডা।

কি হলো গো ?

: কিছু হয়নি চুপ কর।

সারারাত খোয়া জ্বেলে সেঁক দিয়েছিল শিউলী। সারারাত জেগে কাটিয়েছিল। মাঝে একবার ঘরে শিকল দিয়ে মায়ের থানে গিয়েছিল শিউলী। তখন সবাই চ'লে গেছে। পূজা মণ্ডপ খাঁ খাঁ করছে। শুধু ভুটো একটা কুকুর ছ্যাক্ ছ্যোক্ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবু ভয় যায়নি শিউলির। তার কেবলই বাঁ চোখ নাচতে থাকে। মনে হয় যেন একটা অমঙ্গলের লতানে সাপ হিল হিল ক'রে তাকে চারিদিকে বেড় দিয়ে বেঁধে ফেলে। গভীর রাতে কেষ্টকে জড়িয়ে ধরে। বলে :

: এ্যাই—এ্যাই—শুনছ ? ওঠো

চোখ রগড়ে কেষ্ট উঠে বসে : কি হ'লো ?

: আমার কেমন ভয় করছে বাপু

: ধুস, তোর ঐ এক কথা।

তুমি পাঁঠা কাটা ছেড়ে দাও।

চিৎকার ক'রে ওঠে কেষ্ট। : না—বার বার সেই একই কথা। মা তোকে ছেড়ে দেয়ে লয় ?

চোখ ছল ছল করে শিউলির।

: না তার জন্যে লয়,

: তবে কি ?

একটা ঢোঁক গিলে শিউলি কেষ্টর হাতে চায়ের কাপটা তুলে দেয়। মাটিতে নোখ দিয়ে আঁচড় কাটে বলে : কিছু খোঁজ রাখ তুমি, তাই বলবো ? কেষ্টচায়ের কাপ রেখে শিউলির মুখটা দু হাতে ধ'রে ভালো ক'রে দেখে। মুক্তার বিন্দুর মত জল টল টল করছে কালো পাতার কিনারায়। শিউলী জড়িয়ে ধরলো কেষ্টকে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো :

: আমরা দু জনই কি থাকবো ? আর একজনআসবে না ?

ও-হো—হো এই কথা ? বলেই কেষ্ট শিউলিকে বুকে টিপে ধরে আদর করতে থাকে। চুমায় চুমায় তার সারা মুখটা আদরে ভরিয়ে দিয়ে বলে :

: ঠিক আছে, দেখবি মায়ের দয়া হ'লেই আমাদের ঘরে একজন নতুন কুটুম আসবে।

সেও আমার মতই—

সঙ্গে সঙ্গে শিউলি তার মুখে হাত চাপ দিয়ে দেয়।

ঃ থাক বলতে হবেনি

* * * *

শিউলির দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে। বাড়ন্ত সুপুষ্ট দেহে চলতে ফিরতে তার দেহের ছন্দে যেন জলতরঙ্গের বাজনা বাজে। একদিন কেষ্ট তাকে ধরে ফেলে পরখ করে। বলে ঃ কি ব্যাপার বলতো শিউলি? তোর মুখে কোন কথা নেই বার্ত্তা নেই।

শিউলি শুধু মুচকি হাসে। কেষ্ট শিউলিকে দু হাতে ধ'রে যেন কি খোজে, তার গা শুঁকতে থাকে।

ঃ কি যে করো, তুমি কি পশু না কি?

ঃ হুঁ—ধ'রে ফেলেচি, কিসের একটা বাস ছাড়ছে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শিউলি বলে ঃ বুঝেছ মশাই সে আসছে—।

কেষ্ট শিউলিকে আদর করতে গেল। কিন্তু দুটো হাত দিয়ে সে আর শিউলিকে তুলতে পারলো না। তার হাত দুটো এই মুহূর্তে অবশ পাথর হ'য়ে যায়। একটা গোঙানির শব্দ ক'রে মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো কেষ্ট। শিউলি হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। জ্ঞান ফিরলে শিউলি জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি হ'য়েছিল? অমন গোঙিয়ে উঠলে কেন?

ভয় থম থম চোখে কেষ্ট বলে, আমাদের যে ছেলে হবে, তাকেও তো আমার মত মায়ের থানে চোট করতে হবে? শিউলি শিউরে উঠলো। কেষ্টকে দু হাতে জড়িয়ে ওর মুখটা হাত চাপা দিয়ে অস্ফুটে বলে ঃ না— আমি তাকে নিয়ে এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবো—

কেষ্ট কাঁদছে, শিউলিও কাঁদছে।

পূর্ব আকাশ তখন ফিকে হয়ে আসছে। কালো পর্দাটা যেন কে ধীরে ধীরে সরিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে। দু' এক ঝাঁক পাখী সেই সবে বাঁসা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে। গাছে গাছে বাতাস লেগে পত্র-পুষ্প যেন মনের আনন্দ ফিরে পেয়েছে। শিউলী আছাড় খেয়ে পড়লো, ঃ মা গো! তুমি দয়া করো। তুমি ওকে রেহাই দাও—। মায়ের বেদী থেকে সেদিনই স্নান ক'রে মাটি এনে কেষ্টকে খাইয়ে দিয়েছে।

আর আশ্চর্য্য ! কেষ্ট যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলো ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই।

শিউলী বলল, : তুমি আজ চান করে মায়ের চান জল খেয়ে এস দিকি—

সে দিনই কেষ্ট চান করে গলায় কাপড় দিয়ে মায়ের থানে গিয়ে বসল। পুরুত ঠাকুর জিগ্যেস করল, কি রে কেষ্ট ?

: একটু চান জল নোব, মায়ের চরণ ধোয়া জল।

* * * *

দেখতে দেখতে দশ মাস গড়িয়ে গেছে।

শিউলী বাবাকে লিখলো : এ বছর আমরা বারোয়ারী পূজায় এখানে থাকবোনি। তুমি আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। কেষ্টকে বললো : তুমি পুরুত ঠাকুরকে জবাব দিয়ে এস। এ বছর অন্য কাউকে দিয়ে পাঁঠা বলি করিয়ে নেবে।

কার্ত্তিক মাস ঢুকতে না ঢুকতেই শিউলী যেন পাগল হ'য়ে উঠলো :

: তা' ছাড়া আমাদের ঘরেতে যে নতুন কুটুম আসছে। এখানে কে দেখবে ? কে করবে ?

শিউলীর বাবা অবশ্য এ জন্যই শিউলীকে নিয়ে গেল। কেষ্ট যেন কয়েক দিন বাদেই যায়।

কেষ্ট দিন কয়েক যেন একা একাই কাটালো। নিজের কাজ সামালে দিয়ে দিন কতক লক্ষ্মীপুরেই কাটাবে ঠিক করলো। শিউলী পই পই ক'রে বারণ ক'রেছে : পুরুত ঠাকুরকে বলবে এ বছর যেন তোমাকে রেহাই দেয়। কালী মায়ের মাটি মাদুলীতে পুরে হাতে বেঁধে দিয়েছে, ভাবনা কি !

পুরুত ঠাকুর আকাশ থেকে পড়লো।

: সে কিরে কেষ্ট ? তা হ'লে চোট করবে কে ?

: এক বছর চালিয়ে নেবেন ঠাকুর। শ্বশুর বিশেষ ক'রে যেতে লিখেছে বৌটাও চলে গেছে, তাছাড়া ··

এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেষ্টর বুকটা কেঁপে উঠলো।

: তা যখন যাবি বলে ঠিক করেছিস তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা করবো। পুরুত ঠাকুর কেষ্টকে ছেড়ে দিলো।

যেন একটা ভারী পাথর কেষ্টর বুক থেকে নেমে গেল।

কেষ্ট সোজা চলে গেল মায়ের থানে। বারোয়ারী কালী। ছু' মেঠে হচ্ছে। আর ক দিন বাদেই কার্তিকের শেষে পূজা। পাড়ার যত ছেলে-মেয়ে ঝাঁক বেঁধে খেলাধূলা করছে। মায়ের ঘরটা মেরামত হচ্ছে। কয়েক-জন মাতব্বর দাঁড়িয়ে।

কেষ্ট গিয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম করলো।

—কিরে কেষ্ট, কি খবর?

—এ বছর বাপু পূজোয় থাকছি নি। তাই মাকে পেন্নাম করতে এলাম।

: সে-কি-রে? তবে···চোট?

: পূজারী ঠাকুর ব্যবস্থা করবে। বলে এসেছি। কেষ্ট এখন বেশ হাল্কা।

রায়পুরে দিন কতক বেরিয়ে কেষ্ট লক্ষ্মীপুরে গিয়ে হাজির।

শিউলী সব চাইতে খুশী। বললে, : এখানে দিন কতক থেকে যাও, ওখানে পূজা বাদ যেয়ো। আর হ্যাঁ, কই দেখি হাতটা। ডান হাতটা তুলে শিউলী দেখলো, না মাতুলিটা ঠিকই আছে।

বললে : ধুয়ে জল খেয়ো। নইলে মায়ের শাপ লাগবে।

দিনকতক লক্ষ্মীপুরের খাল-বিল মাঠ ঘুরে বেড়ালো কেষ্ট। কালী পূজোর দিন সকালে উপোস করে রইলো। শিউলীর পেটটা কে যেন সকাল থেকেই টেনে ধরেছে। তবু ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে কেষ্টকে বলল: উপোস করার কি দরকার, তুমি তো আর এ বছর পাঁঠা বলি করবে না, তবে?

: না, থাক্ চিরকাল উঁপোস করে এসেছি। আর আজ অমাবস্যা মনটা মানছে না। নাই বা সেখানে থাকলাম উপোস করলে ক্ষতি কি?

সারাটা দিন কেষ্ট বৈঠকখানায় ঝুম মেরে বসে কাটিয়েছে। শিউলী মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু সন্ধ্যের পর একেবারে ঘর নিল।

অনেক বলা কওয়া সত্বেও কেষ্ট কিছুই খেল না। সন্ধ্যা বেলাতে

চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল কেষ্ট।

*   *   *   *

অমাবস্যার গভীর রাত। কেষ্টকে যেন কে ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দিলে। বিহ্বল মাতালের মত কেষ্ট উঠে পড়ে ছুটতে আরম্ভ করলো দামোদরের তীর ধ'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে। একটা ঘনীভূত অন্ধকারের ঝাঁপি পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। কে যেন পর্দ্দার তলায় ছুটে চলেছে উন্মত্তের মত উদ্‌ভ্রান্তের মত। যেন একটা দস্যুর কালো ঝাঁপি থেকে মুক্তির জন্য কেষ্ট ছুটে চলেছে। আর পিছনে বিরাট নেকড়ের থাবা নিয়ে কালো গহ্বরটা তাড়া করে আসছে।

কেষ্ট শুনতে পায় চিৎকার। মোঁ ··। কেষ্ট শুনতে পায় পাঁঠার ককানি—ম্যা। পূজা মণ্ডপের ভীড় ঠেলে কেষ্ট হাজির। হাঁপাচ্ছে। চারদিকে রব, কেষ্টা এসেছে কেষ্টা এসেছে ··

পূজারী ঠাকুরের হাত থেকে হেতেরটা ছিনিয়ে নিলে কেষ্ট।

আমি এসে গেছি ঠাকুর। সারাদিন উপোস করে আছি।

কেষ্টর গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে পূজারী ঠাকুর। কেষ্ট সমস্ত শক্তি দিয়ে কোপ মারলো। এত জোরে ··যে হাতটা এক· ঝলক বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে নীচে নেমে এল, আর মুহূর্তের মধ্যে পাঁঠাটা আধখানা হয়ে গেল।

সকলে চিৎকার ক'রে উঠলো, সুন্দর চোট হয়েছে। সুন্দর বলি হয়েছে।

বাজনা ও ছেলেদের চিৎকারে সব ডুবে গেল।

কেষ্ট দামোদরের ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এল। চাবিটা খুলে একটা মাদুর বার করে দাওয়ায় পাতলো। কয়েক দিন না থাকার ফলে চামচিকের উৎপাত হয়েছে।

কেষ্ট মাদুরের ওপর শুয়ে পড়লো। আজ আর গায়ে কোন ব্যথা নেই। কোন বেদনা নেই, মাদুলীটা মাথায় ঠেকালো : মাগো···দেখো

ঘুমিয়ে পড়েছিল কেষ্ট। বেলা হয়ে গেছে। রোদ এসে পড়েছে উঠোনময়। শীতকালের সোনাঝরা রোদ। একটা খেঁকি কুকুর ছোঁক্—ছোঁক্ করে কি শুঁকে বেড়াচ্ছে। কার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল কেষ্টর।

: খুবতো পালিয়ে এয়েছ, আর আমরা শালা, ভেবে মরি।

কেষ্ট ঘুম জড়ানো চোখে চাইলো। কেষ্টর ছোট শালা ফণী। এক হাঁটু কাদা মেখে হাজির।

: চলো, দিদি সেই যে ঘরে ঢুকেছে, সবাই ভাবচে। যন্ত্র চালিতের মত কেষ্ট ফিরে চলেছে লক্ষ্মীপুরে। তার শালা ফণী আগে আগে। গল্ গল্ করে অনেক কথা বলছে ও। কিন্তু কেষ্ট নির্বাক।

তার চোখের সামনে এখনও ঝাপসা। সোনাঝরা রোদ মনে হচ্ছে কুয়াশা। লক্ষ্মীগঞ্জে ঢুকতেই একটা শেয়াল চিৎকার করে উঠলো। কেষ্ট কানে হাত দিল।

ফণী হো হো করে হেসে উঠলো :

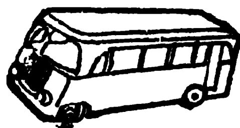
: আরে জামাইদা, তুমি এত ভীতু। শ্বশুর বাড়ীর সদর দরজায় পা দিতেই কারা যেন কেঁদে উঠলো। শুধু যন্ত্রচালিতের মত হাত ধরে কেষ্টকে ফণী একটা অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। অচৈতন্য অবস্থায় শিউলি। মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে। আর ন্যাকড়ার উপর একটা লাল রক্তপিণ্ড।

কিন্তু ওকি।

পিণ্ডটার মাথার কাছে ঘাড়ে কে যেন একটা ভোঁতা কাটারী দিয়ে কেটে হাঁ করে দিয়েছে!

ঘরময় চাপ চাপ রক্তে ভর্তি। একটা পচা বীভৎস গন্ধ নাকে এল। কেষ্ট পাথর কেষ্ট হিম।

কালো অভিশপ্ত, অমাবস্যার অন্ধকারে ভরা একটা ঝাঁপি। ঘাতকের ভয়ে এই মানব পুত্রটি মুক্তির নেশায় কি পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল? সে পালিয়েও এসেছে—কিন্তু—ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত পিণ্ডের দেহ নিয়ে।



মন

কে ভাবতে পেরেছিল, মঞ্জু বৌদির এই পরিণতির কথা! সে কি আত্মহত্যা, না মরীচিকার পিছনে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া একটি জীবন! আজও নির্জনে বসে যখন ভাবি, তখন মঞ্জুবৌদির এই বিচিত্র পরিণতির কোন হদিসই পাই না। সুঠাম দেহবল্লরী, নিটোল মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রঙ —ঘষা কাঁচের জলে ভেজা অমসৃণতলে ঠিকরে পড়া আলোর ছটা। শাড়ী আর ব্লাউজের তলে লুকিয়ে থাকা দেহলতাটি কার না লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতো!

ডি-ল্যুক্স বাসের গদীমোড়া সিটে বসে থাকা মঞ্জুবৌদিকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে ষ্ট্যাণ্ডে বাসটা দাঁড়াতেই চীৎকার করে উঠেছিলাম: মঞ্জুবৌদি—একবার মাত্র আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল মঞ্জুবৌদি। তারপর সংযত হয়ে চোখ দুটো বুজে নিচের দিকে নামিয়ে নিয়েছিল। কেমন যেন অপরাধী মনে হয়েছিল। কেমন যেন অপরাধী মনে হয়েছিল নিজেকে। এঠাচি, স্যুটকেশ ও চুপড়িটাকে রিক্সায় তুলে দিয়ে বলেছিলাম, ওঠো—

একটি কথাও বলেনি মঞ্জুবৌদি। রিক্সায় পাশাপাশি বসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছিল, যেন কত বিরাট ব্যবধান দুজনের। আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল। একবার আড়চোখে মঞ্জুবৌদির দিকে তাকালাম। পরণে সাদা জড়িপাড় শাড়ী। সিল্কের। গায়ে চাঁপা রঙের আঁটসাঁট ব্লাউজ। দেহের খাঁজে খাঁজে দুকূল ছাপিয়ে যৌবনের ঢল নেমেছে। চোখের পাতা দুটো জলে ভেজা পাখীর ডানার মত ভারী। নরম পাতার গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে বেদনার বিন্দু। আমার বুকের ভিতরটা টন্-টন্ করে উঠলো।

: এই যৌবন এই দেহ এই বয়স। ভগবানের কি নিদারুণ অভিশাপ।

মঞ্জুবৌদির ব্যথার ছুরিটা যেন আমার শিরা উপশিরাগুলো কেটে তছনছ করে চলেছে। কি করে সময় কাটবে মঞ্জুবৌদির! শুনেছিলাম, আসানসোল থেকে মঞ্জুবৌদি আর আসবে না। সেখানেই একটা স্কুলে চাকরী নেবে। কোম্পানীও অবশ্য একটা চাকরী দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু না। যে কোম্পানীর কাজ করতে করতেই জীবন দিল অশোকদা সেই কোম্পানীর ছায়াও যেন মঞ্জুবৌদির কাছে বিষ।

বাবা অবশ্য আসানসোল থেকে ফেরার সময় অনুনয় করেছিলেন: তুমি চলে এস বৌমা? আমাদের আছে। আমরা কি নিয়ে বেঁচে থাকবো মা!

আমার মা বড়ছেলের শোক সহজে ভুলতে পারেননি। বিছানা নিয়েছিলেন বেশ ক-দিন।

ঘরে আমরা ঢুকতেই মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বাবা খুক খুক করে কাসতে কাসতে লাঠি ধরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মঞ্জুবৌদি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই বাবাও ছোটছেলের মত নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য মঞ্জুবৌদি! একটুও কাঁদলো না, একটুও উত্তেজনা প্রকাশ করলো না। যেন একটা প্রবল বন্যাকে মনের শক্ত বাঁধ দিয়ে আটকে দিয়েছে। কিন্তু বিপদের মেঘ কাটেনি। আষাঢ়ের জলভরা ঘন মেঘের মতই চোখ দুটো ভারী, যে-কোন মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি নামলে বন্যার বাঁধ ভেসে যেতে পারে।

স্যুটকেশ থেকে একগোছা নোটের তাড়া আমার হাতে তুলে দিল মঞ্জুবৌদি। এই প্রথম কথা বলল: বাবাকে দাও, কোম্পানী তোমার দাদার জীবনের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

বাবা সে টাকা নিলেন না। বললেন: নেমকহারাম, আমার ছেলেকে খেয়েছে আবার টাকা দিয়ে তার দেনা শোধ করতে চায়। এ দেনা পরিশোধ করা যায় না।

হাউ হাউ করে অসহায় শিশুর মত কেঁদে উঠলেন বাবা। কিন্তু ধন্যি মঞ্জুবৌদি।

একদিনের মধ্যেই যেন সে আমাদের সকলের মনের পাঠ পড়ে নিল।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো যেন আমাদের বিবর্ণ বাড়ীটা। মঞ্জুবৌদিই তাকে ক্ষিপ্রহাতে তুলে যেন স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে হাল ধরলো। অশোকদার বিচ্ছেদের শোক কেবল দোতলার মঞ্জুবৌদির ঘরে টেবিলে রাখা ফটোটার মধ্যে কোন এক বিশেষ সময়ের জন্য বাঁধা রইলো। আমাকে একদিন বললো :

—সমীর, আমাকে বাজারে নিয়ে চলো।

—কেন ?

ধমক দিয়ে উঠলো মঞ্জুবৌদি : পাকামো করো না। যা বলবো তাই শুনবে।

সেদিন থেকে আমিই মঞ্জুবৌদির একমাত্র সাথী হলাম। বাজার থেকে খাট পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল, মীটসেফ, চেয়ার, টেবিলে ঘর ভর্তি হতে লাগলো, আমাদের পুরানো বিছানাপত্র বদলে নতুন গদীমোড়া নরম তোষক, বালিশ এলো। কাঠের ও ষ্টীলের রকমারি আলমায়রা···

মা ও বাবা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

—কি করছো বৌমা ?

বাবা ও মাকেও মঞ্জুবৌদি ধমক দিল :

—আপনারা চুপ করুন। সারাজীবন কষ্ট করেছেন, বুড়ো বয়সেও এই ভাঙা-নড়বড়ে তক্তপোষে শুয়ে কষ্ট পেতে হবে ?

—কিন্তু এত টাকা ?

মা অনুযোগ করতে গিয়ে আটকে যান।

—আপনার ছেলের টাকা। কোম্পানী দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, আর মসে পাঁচশো টাকা করে দেবে। আপনার ছেলে বেঁচে নেই

মঞ্জুবৌদির গলাটা ধরে এলো। কিন্তু সে এক মুহূর্ত মাত্র। তারপর হৈ-হৈ করে আমার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো ওপরে দোতলায়।

—এই সমীর, চলো, হাত লাগাও, এই ধর টেবিল দুটোকে সাজিয়ে ফেল দেখি।

মঞ্জুবৌদির সযত্ন স্নেহস্পর্শে যেন দামোদরের তীরে আমাদের বাড়িটির সব প্রত্যাশা পূরণ করলো। জানালা দরজায় দামোদরের স্রোতভাঙা উদ্দাম

বাতাসের প্রবেশ নিষেধ হলো—পর্দা দিয়ে তার পথকে আটকানো হলো। বার্ডসেম ও স্নোসেম যেন রঙের জেল্লায় হেসে উঠলো।

দুদিন কলেজ বন্ধ করে আমিও ঘর সাজাতে লাগলাম। ঘরের চেহারা বদলে গেল। যেন মনের আনন্দে হাল্কা হাওয়ায় দেহের জৌলুস নিয়ে তরতর করে নেচে চলেছে আমাদের বাড়ীটা। মাকে রান্নাবান্নার কাজ থেকে ছুটি দিল।

রাঁধুনী এল, চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করার ঝি, আর বাগানে ফুলের কেয়ারি করবার জন্য এল মালী। আমি আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলাম :

—মঞ্জুবৌদি, কি মনে করেছ তুমি? আমাদের কি পথে বসিয়ে ছাড়বে?

মঞ্জুবৌদি অবাক হয়ে বললেন : কেন?

—এত খরচ করার কি দরকার?

মঞ্জুবৌদি হো-হো করে হেসে উঠে আমার গালে একটা টোকা দিয়ে বললো, ও, তাই বলো। আমি মনে করি, কি-না-কি? তা খরচ করছি তো আমার টাকা। বাবার পেনসনের টাকাটা না হয় সেভিংসে জমা রেখো।

আমি কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে ভার মুখে দাঁড়িয়ে আছি দেখে মঞ্জুবৌদি আবার আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললো : সমীর ভাই, তোমার যখন বৌ আসবে তখন যদি তার ঘর পছন্দ না হয়···

আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। জোর করে মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম : ধেৎ যতো সব ইয়ে—আমি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াইনি। আমার চোখমুখ, কান, নাক, মাথা যেন আগুনের আঁচে পুড়ে যাচ্ছে। বৌদির নরম বুকটা যেন আগুনের তুলোর মত, ফুলকি দেওয়া আঁশগুলো যেন এখনো আমায় বিঁধে মারছে। আমি ছুটে পালিয়ে আসছি দেখে হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো মঞ্জুবৌদি।

—সমীর, যেও না শোন·· শোন ··

কিন্তু আমি শুনিনি। থামিওনি। আমার কানের পর্দায় মঞ্জুবৌদির হৃৎস্পন্দন তখনও বাজছে। আমি দম বন্ধ করে দোতলা থেকে নেমে একতলায় এসে হাঁফ ছাড়ি।

মঞ্জুবৌদি রান্নারও তদারক করতো। রাত্রে আমি আর বাবা একসঙ্গে খেতে বসলে টেবল ফ্যানটা এনে প্লাগটায় লাগিয়ে দিত। কাছে বসে ঠাকুরকে ফাইফরমাস করতো।

—এটা দাও, আর একখানা পরোটা, বাবাকে আর একটু তরকারী—

মঞ্জুবৌদির নিপুণ তদারকিতে বাবা ও মায়ের শরীর ভরাট হয়ে উঠলো। বিকাল হলেই বেড়াতে যাবার আগে বাবার হাতের মুঠিতে ছড়িটা, চাদরটা জুগিয়ে দেওয়া, চাকরকে বলে চটিটা পালিশ করিয়ে দেওয়া, মায়ের পূজো-আর্চার জোগাড় করানো, আর ব্রতের দিনে ফল-ফুলের ব্যবস্থা করা। এক কথায় মঞ্জুবৌদির হাতের ছোঁয়া পেয়ে যেন আমাদের পুরানো বাড়ীটা হাসি-খুশির রোশনাই-এ ঝলমল করে উঠলো।

যেন অশোক বলে বাড়ীর কোন বড় ছেলে আসানসোলের নামকরা কোম্পানীর সম্ভাবনাময় চাকুরে ছিল না। ফ্যাক্টরীর হুইল ভেঙ্গে যেন কোন এক সুদর্শন তরুণ কোনদিনই সেই অঘটনের বলি হয়নি। যেন সব ঠিক ছিল, ছিল যা তাই আরো ভালো হলো। মাঝখানের কটা দিন একটু যেন ধাক্কা লেগেছিল বাবা, মা ও সুন্দরী মঞ্জুবৌদির বুকে।

আসানসোলের ছোট বাংলোতে যেদিন চেলী-পরা মঞ্জুবৌদি এলো, সেদিন থেকেই মঞ্জুবৌদিকে এত ভালো লেগেছিল, কি বলবো! রাঁচীর কোন এক মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা কনভেন্ট-পড়া মঞ্জুবৌদির সঙ্গে নামকরা কোম্পানীর নতুন ম্যানেজার অশোকদার কি করে আলাপ, কোথায় আলাপ এবং কেমন করে সে আলাপ প্রেমে পরিণত হয়েছিল, তা সবই মঞ্জুবৌদির কাছে বার বার শুনেছি।

বিয়ের পর কদিনই বা কেটেছে। বছর খানেক বইত নয়। একটি দিনের জন্য অশোকদা মঞ্জুবৌদিকে কাছ-ছাড়া করেনি। হয়ত সমস্ত সুখ-আহ্লাদ ভাগ্যের পরিহাসে কোন শূন্যে মিলিয়ে গেল।

বৌদি বয়সে আমার চেয়ে দু-এক বছরের বড় হয়ত। কিন্তু অশোকদার বাড়ীতে যখন গেছি, মনে হয়েছে একজন যেন খেলার সাথী আমার অপেক্ষায় বসে আছে। ফিকে চাঁপা রঙের শাড়ী মিলিয়ে ব্লাউজ, কপালে সোনালী চন্দনের টিপ, গলায় হীরে বসানো পেণ্ডেন্ট হার, ছিমছাম পোযাকে

যেন একটা গোলাপ ফুল। কি ভালোই যে লাগতো মঞ্জুবৌদিকে।

মঞ্জুবৌদির বাবা খুব বড়লোক। কলকাতায় বিরাট বাড়ী। মাঝে মাঝে বর্ধমান এসে মেয়েকে দেখে যেতেন। একবার নিয়েও গেলেন কলকাতায়। কিন্তু কলকাতা থেকে ফিরে মঞ্জুবৌদি কেমন যেন হয়ে গেল। নিজের ঘরটিতে চুপ-চাপ বসে থাকতো। কেবল বাবা ও মার কোন কাজের সময় তাড়াতাড়ি নেমে আসতো ওপরতলা থেকে। এটা সেটা হাতের কাছে জুগিয়ে দিত। একটি কথাও বলতো না। বাবা সেটা লক্ষ্য করে বলতেন: কি গো, মায়ের আমার শরীর খারাপ নাকি? মা হয়তো অন্তরের ব্যথা বুঝতেন। কিছু না বলে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। আমার সঙ্গেও বড় একটা কথা বলতো না। আমি বুঝতে পারতাম, আমাকে এড়িয়ে চলছে, মঞ্জুবৌদি। একদিন দোতলায় অশোকদার ঘরটা উঁকি দিয়ে দেখি, মঞ্জুবৌদি টেবিলের ওপর মাথা রেখে বসে আছে। চুলের খোঁপা খুলে বিনুনীর লতানো দেহটা পিঠের ওপর এঁকে-বেঁকে নেমে এসেছে। সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকলাম।

বৌদি লাল চোখে তাকালো একবার। বললো: আমায় বিরক্ত ক'রো না সমীর। নিজের কাজ দেখ।

আবার সব যেন ঠিক হয়ে গেল। মঞ্জুবৌদি আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

একদিন সন্ধ্যায় ওর ঘরে হাত ধরে টেনে নিয়ে বসালো। বললো: সেদিন আমার উপর রাগ করেছিলে ভাই?

—না, তোমার মন খারাপ দেখে···

মন খারাপ। মুচকি হাসলো বৌদি। মনই যে নেই, তার খারাপ কি ভাই? আর তাছাড়া সব সময় কি হাসতে হবে?

শেষের কথাগুলো বলার সময় গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বৌদির ঘরে জানালার খোলা কপাট ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। বৌদি খাটে। বুঝতে পারলাম, চোখ মুছছে।

মঞ্জুবৌদির জন্য আমার মনটা গুমরে কাঁদতে লাগলো। যদি হাসি-খুশিতে উচ্ছল মঞ্জুবৌদির জন্য কিছু করতে পারতাম!

তারপর বৌদি কয়েকবারই কলকাতায় গেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই সেই এক ঘটনা। কলকাতা থেকে ফিরে মঞ্জুবৌদি যেন কেমন হয়ে যেত। কোথায় যেন তলিয়ে যেত। আমি তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারতাম না।

একবার আমিও মঞ্জুবৌদির সঙ্গে কলকাতা গেলাম। বৌদির অনুরোধেই। তার রুচিমত, অশোকদারই স্যুট পড়ে। মঞ্জুবৌদির বাবার বিরাট বাড়ী। গাড়ী আছে। বৌদিই বাড়ীর বড় মেয়ে আরও বোন আছে। দু-দাদা। কোথায় যেন বিরাট কারখানা আছে। বাবা খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক। মা কিন্তু ঠিক বিপরীত। অত্যন্ত নরম ভাবপ্রবণ মহিলা। যেন কঠিন শিলাস্তরের উপর নরম পলির আস্তরণ। বড় মেয়ে যেতেই উনি কেঁদে ফেললেন।

—ভালো ছিলি? কি দরকার বর্ধমানে থাকবার! আর যেতে হবে না, আমার কাছেই থাক না মা।

মঞ্জুবৌদি বিরক্তি প্রকাশ করে ঠোঁট উল্টে বললো: তোমাদের এখানে থাকতে না পারলে?

বিকালে বেড়াতে বেরুলাম। গাড়ীতে। মঞ্জুবৌদি ও আমি। মঞ্জুবৌদির কত বন্ধু! এখান সেখান ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে হয়ে এল। বৌদি বললো: চলো কিছু খাওয়া যাক।

একটা রেষ্টুরেন্টে এলাম।

সেখানে রং-বেরঙের পোষাকে ঝলমল মেয়ে-পুরুষের মেলা। অনেকেই মঞ্জুবৌদিকে চেনে। দু-একজন পুরুষ বন্ধু তো মঞ্জুবৌদি যাওয়া মাত্র হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। আমি একটা চেয়ারে বসে রইলাম।

বুঝলাম, মঞ্জুবৌদিকে নিয়ে ওরা খুব হৈ-চৈ করছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘণ্টা বেজে উঠতেই পাশে দাঁড়ানো অর্কেষ্ট্রা পার্টির লোকজন খুব তীক্ষ্ণস্বরে মিউজিক বাজাতে লাগলো।

ওদিকে মেয়ে পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় নাচ সুরু করেছে। মঞ্জুবৌদিকে একজন সুদর্শন পুরুষ ইশারা করে কি যেন বলছে। আমি অপ্রস্তুত। এমনি উদ্দাম উচ্ছল জীবনের সঙ্গে কখনো মুখোমুখি হইনি। চলে যাবো কিনা ভাবছি। বল্লাম: বৌদি, আমি একটু ঘুরে আসি।

মঞ্জুবৌদি খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেললো :

— কোথা যাচ্ছ ? দাঁড়াও আমিও যাবো ··

তারপর শাড়ীর আঁচলটা শক্ত করে জড়িয়ে নিয়ে মঞ্জুবৌদি জোড়হাতে বন্ধুদেব নমস্কার করে পিছন ফিরতেই প্রচণ্ড হাসির রোল উঠলো।

হাসির ঢেউটা যেন বৌদিকে হঠাৎ এসে সজোরে আঘাত করলো। এক ঝটকায় ফিরে তাকাল মঞ্জুবৌদি। দুচোখে বিদ্যুৎ ঝলক যেন। তারপর দৌড়েই হোটেলের বাইরে এসে হাঁফাতে হাঁপাতে ডাক দিল। সিংজী

সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের মধ্যে কান্নার রেশ যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

ড্রাইভার এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। আমি শুধু টিউবলাইটের স্বচ্ছ আলোয় লক্ষ্য করছি বিচিত্র মঞ্জুবৌদিকে ·

নরম গদী-আঁটা সীটে দুজনেই চুপচাপ আছি। একসময় যেন নিজেকে এগিয়ে দিল মঞ্জুবৌদি। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল : চলো এখান থেকে চলে যাই ··

মঞ্জুবৌদি তীরবেগে উঠে পড়ে আমার দিকে একটা অপরিচিত চাহনি নিয়ে তাকালো : কোথায় ?

- বর্ধমানে ?

মঞ্জুবৌদি যেন হতাশ হয়ে চোখ বুজলো। আকাশে তখন পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

সেদিনই রাতে মঞ্জুবৌকে কাঁদতে দেখলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে, উপরে আসছি। বৌদির মা আড়ালে ডেকে বললেন : মঞ্জু তো খাবে না বলছে, ঘরে কাউকে ঢুকতেও দিচ্ছে না। বিরক্ত হচ্ছে। তুমি একবার বলে দেখবে বাবা ?

বুঝলাম মঞ্জুবৌদির মাও কাঁদছেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম মঞ্জুবৌদির ঘর অন্ধকার। শুধু ফুঁপিয়ে চাপা কান্নার শব্দ। ডাকলাম : বৌদি। কোন সাড়া নেই, কোন ভাবান্তর নেই। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সংসারে যারা নিজেকে বঞ্চনা করে সবার সুখ, দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নেয়, নিজের অন্তরের ব্যথা কাউকে জানতে দেয় না অথচ তিলে তিলে

নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদের ওপর আমার খুব রাগ হলো। রাগ হলো মঞ্জুবৌদির উপরও

খুব ভোরেই মঞ্জুবৌদি কাতুকুতু দিয়ে ঠেলা মেরে তুলে দিল আমাকে।
—ওঠো —·· ওঠো রেডি হয়ে নাও। বর্ধমানের গাড়ী রেডি—

আমি কি দেখছি, তাই ভাবতে লাগলাম। বুদ্ধিমতী মঞ্জুবৌদি যেন এক নিমেষেই আমার মনের পা ঠ পড়ে নিল। বললো : কি? ভাবছো ·· মঞ্জুবৌদির সেই গোমড়া ফুঁপিয়ে কান্নার মুডটা গেল কোথায়?

মঞ্জুবৌদি এবার সত্যিই আমার মুখের কাছে নিজের মুখ া নামিয়ে এনে বললো : দেখ · কোথাও কোন চোখের জল আছে কি না? আমার গালে মঞ্জুবৌদির গালটা ঠেকাতেই যেন একটা হিম-পিণ্ডের ছোঁয়াচ লাগলো বলে মনে হল।

তখনও রাত্রির কালো বোরখাখানা সরে যায়নি। ফুলের বাগানের ঝোপে ঝোপে অন্ধকার তখনও গাঢ়। মঞ্জুবৌদির মা শুধু গেটের কাছে দাঁ িয়ে আমাদের বিদায় জানালেন। মঞ্জুবৌদিদের বিরাট বাড়ীখানা পিছনে রেখে বাড়ীর গাড়ীখানা ছুটে চললো।

মঞ্জুবৌদি কিন্তু আর সহজ হতে পারলো না। অবশ্য বর্ধমানে এসে আবার সে তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নি য় মেতে থাকবার চেষ্টা ক লো। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না। আমি বুঝতে পারলাম, একট জটিল আবর্তে প ড় ও ংগ্রাম করে চলেছে।

চেষ্টা করলোসব কিছু ভুলে থাকবার। বাবা, মার যত্ন করা। রান্নার তদারকী করা। হা ট বাজারের ফর্দ, জিনিস কেনাকাট। আর আমাকে এড়িয়ে চলা। কোনটাই বাদ গেল ন। কোথায় যেন এক া তার ছিঁড়ে গেছে। ফলে গমক, মীড়, লয়, মূর্ছনা সব টুকরো টুকরো হয়ে ছ িয়ে পড়ছে। একদিন সাহস করে বলি : মঞ্জুবৌ দি, তোমার কি হয়েছে বলোত?

হো হো করে হেসে আমাকে কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করে তুললো মঞ্জুবৌদি।

বললো : আমার ওপর অত নজর কেন? এই কটা দিন সবুর করো, তোমার একটা সঙ্গী এনে দিচ্ছি।

আমি লজ্জায় অবাক হয়ে তাকাই! কি বলছ?

— ঠিকই বলছি। ও তোমার মনের পাঠ অনেক আগেই পড়েছি।

কিন্তু এ খুশি খুশি ভাবটাই মঞ্জুবৌদির মনে ফাঁকি বলে ধরা পড়লো। কারণ শত চেষ্টা করেও মঞ্জুবৌদি আর সহজ হতে পারলো না। পদে পদে প্রতিদিনের পরিচিত কাজে ভুল হতে লাগল। অশোকদার ফটোতে চন্দনের ফোঁটা কবে যে শুকিয়ে গেছে। ফ্লাওয়ারভাসে রজনীগন্ধার শুকনো স্তবক। ড্রেসিং টেবিলে ধুলো জমেছে মোটা হয়ে। বিছানার চাদর ময়লা আধোয়া। নিজের বেশবাসেও যেন ছিরিছাঁদ নেই, উদাস আনমনা। আমাদের ছোট্ট বাড়ীটা যেন ছেঁড়া পালের হাওয়ায় ধুঁকতে ধুঁকতে কোনরকমে এগিয়ে চলেছে।

সেবার আষাঢ়ে ভালো বর্ষা হয়নি। শ্রাবণের শেষ। কদিন ধরে প্রবল বর্ষণ শুরু। বর্ধমানের নীচের মহল্লা জলে ডুবু ডুবু। আমাদের বাড়ীটা দামোদরের তীরে হলেও বেশ উঁচু জায়গাতে। সেখানেও জল উঠতে শুরু করলো। মঞ্জুবৌদি এত জল উঠতে কোনদিন দেখেনি। কেবল জানালার ধারে বসে দামোদরের জলস্রোত দেখতো। একদিন মঞ্জুবৌদি বলল : সমীর চলো না, আমরা একটা ডিঙ্গি নিয়ে ঘুরে আসি।

— তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যা স্রোত!

—বেশ ভালো হতো কিন্তু

রাতে শুতে যাবার আগে দেখিনি। মাঝরাতে জলের কল কল শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে দেখি জলের সেকি মত্তা, আমাদের বাড়ীর বাগান, উঠোন সব ডুবে গেছে। আমি মঞ্জুবৌদিকে ঘুম থেকে টেনে তুললাম। মঞ্জুবৌদি বললো : বাবা, মা নীচেয় আছেন। চলো তুলে আনি।

নীচেয় নেমে এসে দেখি, মেঝেতে জল জমতে সুরু করেছে। ঘরের লাইট সব অফ হয়ে গেছে। অন্ধকারে বাবা ও মাকে ওপরে তুলে নিয়ে এলাম। মা বললো : ওরে বৌমা কোথায়?

আমি দ্রুত নেমে এলাম নীচে। ততক্ষণে মেঝেতে হাঁটুজল। ডাকতে লাগলাম: বৌদি বৌদি পাশেই একতলা টালির ছাউনী দেওয়া রান্নাঘর। সেখানে ঢুকে শব্দ পেলাম, বৌদি মাচায় উঠে ঘর-গে স্থলির জিনিস সামলাচ্ছে। মই বেয়ে ওপরে উঠেও কিছু দেখতে পেলাম না, সব অন্ধকার। কেবল ছোট্ট একটি জানলার অল্প আলোয় বৌদিকে দেখতে পেলাম। কি যেন করছে।

বললাম: বৌদি, বৌদি—নেমে এসো, জল বাড়ছে। একটা বিদ্যুৎ চমকালো, সেই আলোয় দেখলাম বৌদি উপুর হয়ে শুয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

বৌদি বললো: দেখবে এস জলের খেলা। কেমন উন্মাদের মত জল নেচে বেড়াচ্ছে।

মই থেকে মাচায় উঠে বৌদির কাছে এলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম, যেন একটা বিরাট অজগর হাঁ করে ছুটে আসছে। আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে কি ভীষণ! কি ভয়াবহ!

বৌদির একটা হাত ধরে টানতে লাগলাম: চলো জল বাড়ছে যে।

একরকম টেনে হিঁচড়ে মঞ্জুবৌদিকে মই এর কাছে নিয়ে এলাম। বৌদি কিন্তু নীচে রান্নার ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলো: সমীর, যেও না, রান্নাঘরের মেঝেয় মানুষভোর জল। আমাদের ছুটো-পুটিতে মইটাও খসে জলে পড়ে গেল। আমি তখন একটা পা মইয়ে দিয়েছিলাম, তাই ঝুলে পড়েছি।

বৌদি আমার পতনোন্মুখ দেহটাকে ছু হাত দিয়ে মাচার পাটাতন ধরে ঝুলছি। বৌদি আমাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। এক সময় আমাকে নিয়ে মঞ্জুবৌদি ছিটকে পড়লো।

এমন সময় মনে হল, জগদ্দল পাথরের মত টালির ছাউনীটা ভেঙে আমাদের ওপর পড়লো।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, রিলিফ ক্যাম্পের হাসপাতালে শুয়ে রয়েছি। আমি চোখ মেলতেই মা কাছে এগিয়ে এলেন, ঝুঁকে পড়ে কি যেন বললেন।

আমি ঠোঁট নেড়ে বলতে চেষ্টা করলাম : বৌদি—

আমার মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না। আমার অস্ফুট কথা কেউ বুঝতে পারল না। না বাবা। না মা। কেউই না।

মঞ্জুবৌদি উত্তপ্ত যৌবন আর প্রাণোচ্ছল জীবন নিয়ে আলোছায়ায় দোল খেয়ে ফিরছিল। আলোকিত উজ্জ্বল কলকাতা তাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকছিল—ডাক পাঠাচ্ছিল বর্ধমানের আনন্দহীন গৃহী জীবন।

বৌদির ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের মন নিয়ে খেলা, আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। পাশে চোখ পড়তেই দেখলাম বাবা। মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছেন।

—::—